POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ
وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۗ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ○

যাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে, নিশ্চয় তাহাদের জন্য কঠোর আযাব (অবধারিত) আছে। এবং আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

(আলে ইমরান: ৫)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 10

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 48

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 27 Nov, 2025 5 জামাদিউল সানি-1447 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

আমি তোমাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে পরিণতিতে সত্যই বিজয়ী হয়। কল্যাণ ও জয় কেবল সত্যভাষীরই।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

পবিত্র কুরআন মুকাররমে মিথ্যাকে একটি অপবিত্রতা ও নোংরাপনা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন: "অতএব মূর্তির কলুষতা থেকে দূরে থাকো, এবং মিথ্যা বাক্য থেকেও বিরত থাকো।" লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এই আয়াতে মিথ্যাকে মূর্তির বিপরীতে স্থাপন করা হয়েছে; এবং বাস্তবিক অর্থে মিথ্যাও এক ধরনের মূর্তির ন্যায়। অন্যথায় একজন মানুষ সত্যকে পরিত্যাগ করে অন্যদিকে ঝুঁকবে কেন? যেমন মূর্তির নিচে কোনো বাস্তব সত্তা থাকে না, তেমনি মিথ্যার নীচেও বাহ্যিক চাকচিক্য ছাড়া কোনো বাস্তব গুণ বা ভিত্তি থাকে না।

মিথ্যাবাদীদের বিশ্বাসযোগ্যতা এমন পর্যায়ে নেমে আসে যে, তারা সত্য বললেও মানুষ সন্দেহ করে বসে যে এর মধ্যেও বোধহয় কোনো না কোনো মিথ্যার মিশ্রণ রয়েছে। আর মিথ্যাবাদীরা যদি চায় যে তাদের মিথ্যাচার দূর হোক, তা দ্রুত দূর হয় না। দীর্ঘ সময় ধরে কঠোর আত্মসংযম ও অনুশীলন করতে হয়; তারপর গিয়ে তাদের মধ্যে সত্য কথা বলার অভ্যাস গড়ে উঠে।

(আল-হাকাম, খণ্ড ৬, সংখ্যা ৩১, ৩১ আগস্ট ১৯০২, পৃ. ২)

আমি তোমাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে পরিণতিতে সত্যই বিজয়ী হয়। কল্যাণ ও জয় কেবল সত্যভাষীরই। দৃঢ়ভাবে স্মরণ রেখো-মিথ্যার মতো অমঙ্গলজনক আর কিছু নেই। দুনিয়াদার মানুষ সাধারণত বলে থাকে যে সত্যবাদীরাই নাকি বিপদে পড়ে; কিন্তু আমি এ কথা কীভাবে মেনে নেব? আমার বিরুদ্ধে সাতটি মামলা করা হয়েছিল এবং আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহে একটিতেও আমাকে একটি মাত্র মিথ্যা শব্দ লিখতে হয়নি। কেউ কি দেখাতে পারবে যে কোনো মামলায় আল্লাহ্ আমাকে পরাজিত করেছেন? আল্লাহ্ তাআলা নিজেই সত্যের রক্ষক ও সাহায্যকারী। তিনি কি কখনও ধার্মিককে শাস্তি দিতে পারেন? যদি এমন হতো, তবে দুনিয়ায় কেউ সত্য বলার সাহস পেত না এবং আল্লাহ্‌র ওপর থেকে মানুষের বিশ্বাসই উঠে যেত। সৎলোকেরা জীবিত অবস্থাতেই ধ্বংস হয়ে যেত।

বাস্তব কথা হলো-যে শাস্তি মানুষ মাঝে মাঝে সত্য বলার সময় ভোগ করে, তা সত্যের কারণে নয়; বরং তাদের অন্য গোপন পাপাচার ও লুকায়িত দুরাচরণের ফল-অন্য মিথ্যার জন্য প্রদত্ত শাস্তি। আল্লাহ্ তাআলার নিকটে তাদের দুষ্টামি ও কুকর্মের একটি দীর্ঘ শৃঙ্খল থাকে; তারা বহু ভুলের অধিকারী, এবং কোনো না কোনো অপরাধের জন্য তারা অবশেষে শাস্তি পেয়ে থাকে।

(আল-হাকাম, খণ্ড ১০, পৃ. ১৭, ১৭ই মে, ১৯০৬)

তাওহিদের পরে মানবজীবনে সবচেয়ে মহান নৈতিক গুণ এবং একই সঙ্গে সবচেয়ে কঠিন কর্ম হলো-সত্যবাদিতা। সত্যবাদিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক গুণ। এটি মানবনৈতিকতার একটি মৌলিক স্তম্ভ।

73 وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ ۙ وَإِذَا
مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ○

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা ফুরকানের ৭৩ নং আয়াত-এর ব্যাখ্যায় বলেন:

বস্তুতঃ, তাওহিদের পরে মানবজীবনে সবচেয়ে মহান নৈতিক গুণ এবং একই সঙ্গে সবচেয়ে কঠিন কর্ম হলো-সত্যবাদিতা। আমরা হাজারো মানুষকে দেখতে পাই যারা দয়ালু, যারা ন্যায়পরায়ণ; কিন্তু যখন তাদের সাক্ষ্য দিতে হয় এবং তারা দেখতে পায় যে সত্য বলার ফলে তাদের নিজের কোনো অসুবিধা হবে, অথবা তাদের কোনো আত্মীয় বা বন্ধুর ক্ষতি হবে-তখন তারা অবশ্যম্ভাবীভাবে সত্যের কোনো না কোনো অংশ পরিবর্তন করে ফেলে। এই রোগ এতটাই ছড়িয়ে পড়েছে যে আমাদের দেশে মানুষ নির্দ্বিধায় শপথ করে মিথ্যা বলে, এবং একই সঙ্গে এই অভিযোগে রাগও করে যে কেন তাদের মিথ্যাকে সত্য বলে গ্রহণ করা হয় না।

সারকথা, সত্যবাদিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক গুণ। নবীগণ এর উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন, এবং এটি মানবনৈতিকতার একটি মৌলিক স্তম্ভ। কিন্তু আজকাল রাজনৈতিক লাভ অথবা জাতীয় স্বার্থের নামে মিথ্যাকে

আর মিথ্যা বলেই মনে করা হয় না; বরং তাকে একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অথচ মিথ্যা প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিরোধী। মিথ্যা সেই আচরণের নাম-যেখানে কান যা শুনেছে, মানুষ বলে: "আমি তা শুনিনিচ; চোখ যা দেখেছে, সে বলে: "আমি তা দেখিনিচ; হাত যা তুলেছে, সে অস্বীকার করে যে "আমি তো তা তুলি-ইনিচ; মানুষের পা একদিকে অগ্রসর হয়, কিন্তু সে বলে: "আমি তো ওই দিকে যাই-ইনি।" অর্থাৎ, মানুষ অন্য কারও নয়-নিজেরই অস্বীকার করে। এর চেয়ে প্রকৃতিবিরুদ্ধ আর কী হতে পারে!

সন্দেহ হতে পারে এমন বিষয়ে, যেখানে ব্যক্তিগত অনুমানের সুযোগ থাকে; কিন্তু পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ কর্মকাণ্ড নিয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। এবং এসব প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়-অনুভবের বিরোধী কথা বলাকেই মিথ্যা বলা হয়। যে ব্যক্তি নিজের ইন্দ্রিয়কে অস্বীকার করে, সে আসলে নিজ জিহ্বা, নিজ হাত, নিজ পা, নিজ নাক ও নিজ কানকেই অস্বীকার করে। আরও বিস্ময়ের বিষয় হলো, সে এতে এমনভাবে লিপ্ত হয় যেন নিজের বিরুদ্ধে নিজেই সাক্ষ্য দেওয়াতে তার বিশেষ আনন্দ রয়েছে।

মানুষের হাত কোনো এক বস্তু ধরে, কিন্তু সে বলে: "আমি তা ধরিনি-এর অর্থ হলো, সে যেন নিজের হাতকে বলছে: "তুমি সে জিনিস ধরনি।" তার জিহ্বা কোনো খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করে, কিন্তু সে বলে: "আমি তার স্বাদ পাইনি-অর্থাৎ সে নিজের জিহ্বাকেই অস্বীকার করছে। তার কান কোনো কথা শোনে, আর সে অস্বীকার করে-অর্থাৎ সে নিজের কানকে বলছে: "তুমি তো এই কথাটি শোনোনি।"

এ কতই না হাস্যকর ও বিচিত্র ব্যাপার! কিন্তু মানুষ এসবের পরোয়া করে না এবং সুযোগ পেলেই মিথ্যা বলে বসে।

(তফসীরে কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫৮৩-৫৮৪)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

হযরত হাসান ইবন আলী (রা.) বর্ণনা করেন যে তিনি রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সেই বাণী সুস্পষ্টভাবে স্মরণ করেন: "যে বিষয় তোমাকে সন্দিহান করে তোলে, তা পরিত্যাগ করো এবং যে বিষয় সন্দেহমুক্ত ও নিশ্চিততার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, তা গ্রহণ করো। কেননা নিশ্চিততা-দাতা সত্য আত্মিক প্রশান্তি আনে, আর মিথ্যা উদ্বেগ ও মানসিক অস্থিরতার সৃষ্টি করে।"

হযরত ইবন মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন যে রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "সত্য মানুষকে নেকির দিকে পরিচালিত করে, এবং নেকি তাকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি সর্বদা সত্য কথা বলে, আল্লাহ্ তাআলার নিকট সে 'সিদ্দীক' হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়। আর মিথ্যা গুনাহ ও অনাচারের দিকে নিয়ে যায়, এবং অনাচার জাহান্নামের দিকে। যে ব্যক্তি অবিরাম মিথ্যা বলে, সে আল্লাহ্ তাআলার নিকট 'কাজ্জাব' হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়।"

(সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল বুইউ', বাব তাফসীরুশ-শুহুবাত;)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জুমআর খুতবা

মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে সম্বোধন করে বলেন,

أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ نَبِيٌّ بَعْدِي

অর্থাৎ হে আলী! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তোমার সাথে আমার সেরূপ সম্পর্ক থাকবে যেমনটি ছিল হারূনের সাথে মূসার? কিন্তু (পার্থক্য হলো) আমার পরে তুমি নবী নও।

এই মৌলিক নীতিটি মনে রাখা উচিত, ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে যদি কোনো কথা হয়, তবে কঠোরতাও করা হয়; সেখানে নমনীয়তার প্রশ্নই থাকে না।

আমি যদি কোনো বিষয়ে শপথ করেও থাকি, এরপর যদি এর ভিন্ন কোনো বিষয় উত্তম মনে করি, তাহলে ইনশাল্লাহ্ সেটাই করব যা উত্তম হবে এবং এই কসমের প্রায়শ্চিত্ত আদায় করব।

মহানবী (সা.) তাবুকের যুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো পতাকা হযরত আবু বকর (রা.)-কে প্রদান করেন। এছাড়াও হযরত যুবায়ের, হযরত উসায়েদ বিন হুযায়ের, হযরত আবু দুজানা অথবা কতক রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত হুবাব বিন মুনযের (রা.)-কে ছোটো পতাকা প্রদান করা হয়েছিল।

মহানবী (সা.) যুদ্ধের বাহ্যিক সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করার পর দোয়ার প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং প্রস্তুতির শুরু থেকে তাবুকের উদ্দেশ্যে যাত্রা আরম্ভ করা পর্যন্ত এই দোয়া করতে থাকেন,

اَللّٰهُمَّ اِنْ تُهْلِكْ هٰذِهِ الْعِصَابَةَ فَلَنْ تُعْبَدَ فِي الْأَرْضِ **অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক-প্রভু! যদি এই ছোট্ট দলটি (আজ) ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে পৃথিবীতে তোমার ইবাদত করার কেউ থাকবে না।**

এটি একটি অদ্ভুত কাকতালীয় ঘটনা যে, মহানবী (সা.)-এর প্রথম যুদ্ধাভিযান, অর্থাৎ বদরের যুদ্ধের প্রাক্কালে এবং তাঁর (সা.) জীবনের শেষ যুদ্ধাভিযানের প্রাক্কালেও এই একই দোয়া করার উল্লেখ পাওয়া যায়।

তাবুকের যুদ্ধের জন্য মহানবী (সা.) বৃহস্পতিবার যাত্রা করেন এবং তিনি (সা.) বৃহস্পতিবার সফর করা পছন্দ করতেন।

তবুকের যুদ্ধের ঈমান-উদ্দীপক বিবরণ ও মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ

মাননীয় গোলাম মহীউদ্দীন সুলেমান সাহেব, মুরুব্বী সিলসিলা ইন্ডোনেশিয়া এবং মাননীয় ডক্টর মহম্মদ শফীক সেহেগল সাহেব -এর স্মৃতিচারণ ও জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ২৪ অক্টোবর, ২০২৫, এর জুমআর খুতবা (২৪ ইখা, ১৪০৪ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজও আমি তাবুকের যুদ্ধের ঘটনাবলির আরো বিস্তারিত বিবরণ দেবো। একজন ব্যক্তি, জাদ বিন কায়সের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। সেও মুনাফিকদের মধ্যে একজন ছিল, যে আব্দু ল্লাহ্ বিন উবাই-এর পরে মুনাফিকদের দ্বিতীয় বড়ো নেতা ছিল। আব্দু ল্লাহ্ বিন উবাই-এর সাথে মিলে সে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকত। এই সেই ব্যক্তি যে হুদাইবিয়ার সন্ধির সময়ও বয়আত করে নি। সেও আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে যুদ্ধে না যাওয়ার জন্য ওজর-অজুহাত পেশ করেছিল, কিন্তু এই ওজরটিও ছিল এক অদ্ভুত, হাস্যকর, বিশ্রী ওজর। বর্ণিত আছে, তাবুকের যুদ্ধের সময় রসূলু ল্লাহ্ (সা.) বনু সালামার সর্দার জাদ বিন কায়েসকে বলেন, হে জাদ! তুমি কি এই বছর বনু আসফার অর্থাৎ রোমানদের বিরুদ্ধে জিহাদে যাবে? সে বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাকে অব্যাহতি দিন এবং আমাকে পরীক্ষায় ফেলবেন না। আল্লাহ্‌র কসম! আমার গোত্র আমার সম্পর্কে ভালো করেই জানে, আমার চেয়ে বেশি আর কেউ নারীতে আসক্ত নয়। আর আমার ভয় হয়, যদি আমি বনু আসফার অর্থাৎ রোমানদের নারীদের দেখে ফেলি, তাহলে আমি নিজেকে সংবরণ করতে পারব না। এই অর্থহীন উত্তর শুনে মহানবী (সা.) তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং বলেন, ঠিক আছে, যাও! তোমার অনুমতি আছে, তোমার যাবার কোনো প্রয়োজন নেই। তার ছেলে হযরত আব্দু ল্লাহ্ বিন জাদ, যিনি খুবই নিষ্ঠাবান বদরী সাহাবী ছিলেন- নিজ পিতার কাছে আসেন এবং বলেন, আপনি মহানবী (সা.)-এর আহ্বান কেন প্রত্যাখ্যান করেছেন? আল্লাহ্‌র কসম! বনু সালামাতে আপনার চেয়ে ধনী আর কেউ নেই। আপনি নিজেও বের হচ্ছেন না এবং কাউকে বাহনও দিচ্ছেন না; অর্থাৎ কোনো মুজাহিদের জন্য বাহন ইত্যাদিরও ব্যবস্থা করছেন না। সে উত্তরে ছেলেকে বলে, হে আমার পুত্র! আমার কী হয়েছে যে, আমি এই গরম এবং অভাব-অনটনের সময়ে বনু আসফারেরউদ্দেশ্যে বের হব? হে আমার পুত্র! আমি আমার ঘরে এবং আমার এলাকায় থাকা অবস্থাতেই রোমানদের ভয়ে কাঁপছি। সুতরাং এমন লোকদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য আমি তাদের এলাকায় কীভাবে যেতে পারি? আমি তো ঘরে বসেই ভীত। হে পুত্র! আল্লাহ্‌র কসম, আমি একজন বুদ্ধিমান এবং অভিজ্ঞ মানুষ। যুদ্ধ সম্পর্কে আমার বেশ ভালো অভিজ্ঞতা আছে। অর্থাৎ সে বলতে চাইছিল, পরাশক্তি রোমের সাথে যুদ্ধ করা কোনো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এই সব কথা শুনে তার নিষ্ঠাবান পুত্র রেগে যান এবং বলেন, না, আল্লাহ্‌র কসম! এটা কপটতা, যার কারণে আপনি যুদ্ধে যাচ্ছেন না। আল্লাহ্‌র কসম! আপনার সম্পর্কে অবশ্যই আল্লাহ্‌র রসূলের প্রতি কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হবে। বলা হয়, তখন তার বাবা তার জুতো তুলে তার মুখে ছুঁড়ে মারে। তার ছেলে তখন ফিরে যায় এবং তার সাথে আর কোনো উচ্চবাচ্য করেন নি।

এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, জাদ বিন কায়েসের ব্যাপারে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল যে, وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ وَلَا تَفْتِنِّيْ অর্থাৎ, আর তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও আছে যে বলে, 'আমাকে অনুমতি দিন এবং আমাকে পরীক্ষায় ফেলবেন না'। বলা হয়ে থাকে, পরবর্তী সময়ে সে তওবা করেছিল এবং আন্তরিকভাবে তওবা করেছিল আর হযরত উসমানের খিলাফত কালে ইন্তেকাল করে।

(আসসীরাতুন নাববীয়াহ লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৮১৫) (শারাহ আল্লামা যুরকানি, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৭২) (তারিখুত তাবারি, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৮১-১৮২)

পরে তার মধ্যে এই কপটতা আর থাকে নি, বরং সে নিষ্ঠাবান মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। ষড়যন্ত্রকারীরা একস্থানে সমবেত হয়ে সেখানে যু দ্ধের বিষয়ে ষড়যন্ত্র করত। এর বিবরণ পূর্বে ও কিছুটা দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ

তারা তাদের একটি কেন্দ্র তৈরি করে রেখেছিল। মহানবী (সা.) এই কেন্দ্র গুঁড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এর বিস্তারিত বর্ণনায় লেখা আছে, মদীনায় মুনাফিক ও ইহুদীরা এসব ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, অর্থাৎ মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে মুসলমানদের মনোবল দুর্বল করা, মুসলমানদের যুদ্ধে যাওয়া থেকে বিরত রাখার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা এবং এ উদ্দেশ্যে তারা নানা ধরনের কৌশল অবলম্বন করত। নিবেদিত প্রাণ এবং দৃঢ় ঈমানের অধিকারী মু'মিনরা মুনাফিকদের এই ন্যক্কারজনক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে শুধু অবগতই ছিলেন না, বরং তাদের ওপর দৃষ্টি রাখতেন এবং মহানবী (সা.)-এর সমীপে এই লোকদের রিপোর্ট ও পৌঁছত। যদিও মহানবী (সা.) তাঁর দয়াও সহানুভূতির কারণে এই লোকদের ক্ষমা করে দিতেন, কিন্তু যখন (রাষ্ট্রীয়) ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে কোনো বিপজ্জনক ষড়যন্ত্র হতো, তখন তা অত্যন্ত বিচক্ষণতা, তবে কঠোরতার সাথে দমন করার জন্য ব্যবস্থাও নেওয়া হতো।

এই মৌলিক নীতিটি মনে রাখা উচিত, ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে যদি কোনো কথা হয়, তবে কঠোরতাও করা হয়; সেখানে নমনীয়তার প্রশ্নই থাকে না।

যেমন এ ধরনের একটি পদক্ষেপ তখনও নেওয়া হয়েছিল। এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.)-এর কাছে খবর পৌঁছায় যে, মুনাফিকরা সুয়াইলাম নামক ইহুদীর বাড়িতে একত্রিত হচ্ছে, যার বাড়ি জাসূমের কাছে অবস্থিত; [এটিকে বিরে জাসেমও বলা হয়, এটি মদীনার একটি কুয়ো ছিল;] আর মুনাফিকরা লোকজনকে তাবুকের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে যাওয়া থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করছে। মূলত, মদীনায় মুসলমানদের এই যুদ্ধে না যাবার জন্য সব ধরনের নেতিবাচক ষড়যন্ত্র এখানেই করা হতো। রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ কে কিছু লোকের সাথে সেখানে পাঠান এবং নির্দেশ দেন, সুয়াইলামের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হোক; অর্থাৎ এটিকে গুঁড়িয়ে দাও, ধ্বংস করে দাও এবং জ্বালিয়ে দাও। সেই যুগে মাটির ঘর হতো। হযরত তালহা তা-ই করেন, তখন সেই জায়গায় উপস্থিত সমস্ত লোক পালিয়ে যায়। এই পালিয়ে যাওয়া লোকদের মধ্যে একজন ছিল যাহহাক বিন খলীফা, যে মুনাফিকদের সাথে ছিল। সে ঘরের ছাদে উঠে যায় এবং তার পিছনের দিক থেকে নীচে লাফ দেয়, যার কারণে তার পা এবং কবজি ভেঙে যায়। মহানবী (সা.)-এর দয়া ও ক্ষমা তখনও এমনভাবে প্র াধান্য পায় যে, তিনি (সা.) তাদের কাউকেই গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দেন নি এবং কোনো অতিরিক্ত শাস্তিও দেন নি, তবে ষড়যন্ত্রের এই আস্তানা, অর্থাৎ প্রধান কার্যালয়কে ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

(শারাহ যুরকানি, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৭২) (ফারহাঙ্গো সীরাত, পৃ: ৮৪) (আসসীরাতুন নাববিয়া লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৮১৬)

তাবুকের সফরের জন্য প্রত্যেকেই প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিল। আর্থিক কুরবানীর (ত্যাগের) ধারাও চলমান ছিল যেন সফরের ব্যয়ভারের ব্যবস্থা হতে পারে।

গরিব ও অভাবী সাহাবীরা মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হতেন, তখন প্রস্তুতির জন্য তাদের সাহায্য করা হতো। একইভাবে সম্পদশালী লোকেরা সেই সাহাবীদেরকেও বাহন ইত্যাদি সরবরাহ করছিলেন যাদের কাছে বাহন ছিল না, কারণ বাহন ছাড়া এই সফর করা সম্ভব ছিল না। আর মহানবী (সা.)-এরও নির্দেশ ছিল, আমাদের সাথে সেই ব্যক্তিই যাবে যে দৈহিকভাবে শক্তিশালী হবে আর সফরের কষ্ট সহ্য করতে পারবে এবং তার কাছে বাহন ও পাথেয় থাকতে হবে।

সেই সময়ে কিছু সাহাবী কাঁদতে কাঁদতে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন। তারা তাঁর (সা.) কাছে বাহনের জন্য অনুরোধ করেন এবং তারা এর মুখাপেক্ষীও ছিলেন। মহানবী (সা.) বলেন, আমার কাছে তো এখন তোমাদেরকে বাহন হিসেবে দেবার মতো কিছুই নেই। এই কথা শুনে তারা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে যান। এই সাহাবীদের নিষ্ঠা, আনুগত্য এবং অসহায়ত্বের এই অবস্থার বর্ণনা আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে এভাবে দিয়েছেন:

وَّلَا عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَاۤ اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَاۤ اَجِدُ مَاۤ اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَّاَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ (التوبۃ:92)

অর্থাৎ, আর সেই লোকদের ওপরও কোনো অভিযোগ নেই যারা তোমার কাছে এসেছিল যখন যুদ্ধের ঘোষণা করা হয়েছিল, যেন তুমি তাদের জন্য কোনো বাহনের ব্যবস্থা করে দাও। তখন তুমি উত্তর দিয়েছিলে, 'আমার কাছে এমন কোনো জিনিস নেই যার ওপর তোমাদের আরোহণ করাবো'; আর এই উত্তর শুনে তারা ফিরে যায় এবং এই দুঃখে তাদের চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল যে, হায়! তাদের কাছে এমন কিছু নেই যা তারা আল্লাহ্র পথে খরচ করতে পারে। (সূরা তাওবা: ৯২)

এটি সূরা তওবার আয়াত। তাদের এই অনটন ও অনেক বেশি কান্নাকাটির কারণে ইতিহাস ও সীরাতের গ্রন্থ সমূহে তাদেরকে 'বু কাউন' নামে স্মরণ করা হয়; অর্থাৎ, অধিক ক্রন্দনকারী। তাদের সংখ্যার বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কতিপয় পুস্তকে প্রায় আঠারোজনের নাম পাওয়া যায়। তবে সাতজনের নামের ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে। এতে সালেম বিন উমায়ের, উরওয়া বিন যায়েদ, আবু লায়লা আব্দুর রহমান বিন কা'ব, আমর বিন হুমাম, আব্দুল্লাহ্ বিন মুগাফফাল মুযানী, হারমি বিন আব্দু ল্লাহ্ এবং ইরবায বিন সারিয়ার অন্তর্ভুক্ত। একটি রেওয়াতে রয়েছে ইয়ামিন বিন উমায়ের বিন কা'ব নাযারীরও হযরত আবু লায়লা আব্দুর রহমান বিন কা'ব এবং আব্দুল্লাহ্ বিন মুগাফফালের (রা.) সাথে পথে সাক্ষাৎ হয়। এই দুইজন কাঁদছিলেন। তিনি এই দুইজনকে জিজ্ঞেস করেন, কেন কাঁদছ? তারা বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট গিয়েছিলাম যেন তিনি আমাদের বাহন দান করেন,কিন্তু সেখানেও আমরা কোনো বাহন পাই নি। আমাদের কাছে এত ধনসম্পদ নেই যে, বাহনের ব্যবস্থা করে তাঁর (সা.) সাথে জিহাদে যোগ দেবো। এতে তিনি তাদেরকে একটি পানি বহনকারী উট দেন; তারা দুইজন এর ওপর জিন চাপান। এছাড়াও তিনি পাথেয় হিসেবে তাদের কিছু খেজুরও দেন। এভাবে এই দুইজন রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে জিহাদে অংশ নেবার জন্য রওয়ানা হন; এভাবে তাদের ব্যবস্থা হয়েছে। একইভাবে হযরত আব্বাস (রা.) যখন জানতে পারেন তখন তিনিও দুইজন সাহাবীকে বাহন ও পাথেয় সরবরাহ করেন। অবশিষ্ট তিনজনকে হযরত উসমান (রা.) বাহন ও পাথেয় দেন। এভাবে এই সাতজন রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে রওয়ানা হন।

(শারাহ যুরকানি, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৭৪-৭৫) (আসসীরাতুন নাববিয়া লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৮১৬) (তারিখুত তাবারি, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৮২) (আল লউলুল মাকনুন, সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ১৮২)

একইভাবে হযরত আবু মূসা আশআরীর (রা.) গোত্রের লোকেরাও মহানবী (সা.)-এর কাছে বাহনের আবেদন করেন। তারা ছয়জন ছিলেন। তারা হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.)-কে প্রতিনিধি বানিয়ে মহানবী (সা.)-এর কাছে পাঠান। তাকেও মহানবী (সা.) এ কথাই বলেন যে, আমার কাছে তোমাদেরকে দেবার মতো কিছু নেই। বুখারীর রেওয়ায়েতে রয়েছে, তিনি (সা.) কসম খেয়ে বলেন, আমার কাছে দেবার মতো কিছুই নেই। এতে সেসব লোক সেখান থেকে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে যায়। কিন্তু এরই মাঝে তিনি (সা.) হযরত সা'দ বিন উবাদার (রা.) কাছ থেকে উট ক্রয় করেন এবং হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.)-কে ডেকে পাঠান ও বলেন, এই উটগুলো নিয়ে যাও এবং তুমি নিজে নাও ও তোমার সঙ্গীদের দাও। এই ঘটনার বিস্তারিত হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.) স্বয়ং বর্ণনা করেছেন। বুখারীতে রয়েছে, হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.) বর্ণনা করেন, আশআর গোত্রের কিছুর লোকের সাথে আমি বাহন চাইতে মহানবী (সা.)-এর নিকট যাই। তিনি (সা.) বলেন, খোদার কসম! আমি তোমাদের বাহন দেবো না। আমার কাছে তোমাদের দেওয়ার মতো বাহনের কোনো পশু নেই। এরই মাঝে তাঁর (সা.) কাছে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের উট আনা হলো। তিনি (সা.) আমাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন আর বললেন, আশআরী গোত্রের লোকেরা কোথায়? তিনি (সা.) পাঁচটি সাদা কুঁজ বিশিষ্ট উট আমাদেরকে দিতে নির্দেশ দেন। আমরা ফিরে গিয়ে বলাবলি করছিলাম, আমরা যা করেছি তা আমাদের জন্য কখনোই কল্যাণজনক হবে না। আমরা এটা চিন্তা করে তাঁর (সা.) কাছে ফেরত যাই এবং বলি, আমরা আপনার কাছে আবেদন করেছিলাম যে, আমাদেরকে বাহন দিন; আর আপনি শপথ করেছিলেন, আপনি আমাদেরকে বাহন দেবেন না। আপনি কি ভুলে গেছেন যে, আপনি কসম খেয়ে বলেছেন- আমাদেরকে বাহন দেবেন না। তিনি (সা.) বলেন, আমি তোমাদেরকে বাহন দিই নি বরং আল্লাহ্ তোমাদের বাহন দিয়েছেন। আমি যদি কোনো বিষয়ে শপথ করেও থাকি, এরপর যদি এর ভিন্ন কোনো বিষয় উত্তম মনে করি, তাহলে ইনশাল্লাহ্ সেটাই করব যা উত্তম হবে এবং এই কসমের প্রায়শ্চিত্ত আদায় করব।

হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত অপর এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, তিনি বলেন, আমার সঙ্গীরা আমাকে বাহন চাওয়ার জন্য মহানবী (সা.)-এর কাছে আমাকে পাঠায়, কেননা তারাও তাঁর (সা.) সাথে জায়শুল উসরায় যেতে চায়, অর্থাৎ তাবুকের যুদ্ধে যেতে চায়। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র নবী (সা.)! আমার সঙ্গীরা আমাকে আপনার কাছে বাহন চাওয়ার জন্য পাঠিয়েছে। তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্র কসম! তোমাদের দেওয়ার মতো কোনো বাহন নেই। ঘটনাচক্রে আমি এমন সময় তঁ ার (সা.) কাছে চেয়েছিলাম যখন তিনি (সা.) কিছুটা রাগান্বিত ছিলেন আর আমি এটি জানতাম না। আমি মহানবী (সা.) -এর অস্বীকৃতি জ্ঞাপনে এবং মহানবী

যুগ ইমামের বাণী

সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে সর্বোত্তম পন্থায় ঋণ পরিশোধ করে। (সহী মুসলিম, কিতাবুল মাসাকাত)

দোয়াপ্রার্থী: Jahan ara Begum, Bhagwangola, Murshdabad

(সা.) হয়ত আমার ওপর অসন্তুষ্ট– এই আশঙ্কায় কিছুটা দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে ফেরত আসি। আমি আমার সঙ্গীদের কাছে ফেরত চলে আসি আর মহানবী (সা.) যা বলেছেন– তাদেরকে সব খুলে বলি। অল্প কিছুক্ষণ পরেই আমি বেলালের ডাক শুনতে পাই, তিনি আবদুল্লাহ্ বিন কায়েস নাম ধরে ডাকছিলেন। আমি তার ডাকে সাড়া দিই। তিনি বলেন, মহানবী (সা.)-এর কাছে যাও, তিনি তোমাকে ডাকছেন। এটি সেখানে কাউকে ডাকার রীতি ছিল। তখন তো লাউড স্পিকার ছিল না, তাই এভাবে ঘোষণা করা হতো। আমি যখন তাঁর (সা.) কাছে যাই তিনি (সা.) বলেন, এই কয়েক জোড়া উট নিয়ে যাও। আর এই কয়েক জোড়া উট অর্থাৎ ছয়টি উট তিনি (সা.) তখনই হযরত সা'দের কাছ থেকে ক্রয় করেছিলেন। তিনি (সা.) বলেন, যাও, এগুলো নিজ সঙ্গীদের কাছে নিয়ে যাও আর তাদের বলো, আল্লাহ্ (অথবা তিনি বলেছেন,) আল্লাহ্র রসূল (সা.) তোমাদেরকে এগুলো বাহন হিসেবে দিয়েছেন; এগুলোকে বাহন হিসেবে ব্যবহার করো। অতএব আমি এই উটগুলো নিয়ে তাদের কাছে চলে যাই। আমি গিয়ে বললাম, মহানবী (সা.) এই উট তোমাদের আরোহণ করার জন্য দিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ্র কসম! আমি ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদেরকে চড়তে দেবো না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের মধ্য থেকে কেউ একজন আমার সাথে সেই ব্যক্তির কাছে না যাচ্ছে, যে মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে সেই (কসম খাওয়ার) কথা শুনেছিল। পাছে তোমরা এটি ভেবে বসো, আমি নিজের পক্ষ থেকেই তোমাদেরকে কোনো কথা বলে দিয়েছিলাম যা আদতে মহানবী (সা.) বলেন নি। তারা বলে, আমরা তো আপনাকে মন থেকে সত্যবাদী মনে করি। [কারণ প্রথমে তিনি বলেছিলেন, মহানবী (সা.) বাহন দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।] তিনি অত্যন্ত সতর্ক মানুষ ছিলেন। তিনি বলেন, তোমরা আবার এটা মনে করো না যে, প্রথমবার আমি নিজের পক্ষ কথা বলেছিলাম, আর কিছুক্ষণ পরেই উট নিয়ে এসেছি। যা বলেছিলাম, সেটিই প্রকৃত বিষয়।তোমাদের মাঝে এমন কেউ যদি থাকে যে তখন সেখানে উপস্থিত ছিল– তাকে ডাকো যেন সে আমার কথার সাক্ষী হয় যে, মহানবী (সা.) প্রথমবার এই উত্তরই দিয়েছিলেন; পরবর্তীতে উটের ব্যবস্থা হয়। যা-ই হোক, লোকেরা বলে, আমরা তো আপনাকে মন থেকেই সত্যবাদী মনে করি আর আমরা সেটাই করব যা আপনি পছন্দ করেন। হযরত আবু মূসা তাদের কয়েকজনকে নিয়ে সেসব মানুষের কাছে আসেন যারা মহানবী (সা.)-এর কথা, অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর তাদেরকে উট দিতে অস্বীকৃতি জানানো এবং পরবর্তীতে তাদেরকে দেওয়ার কথা শুনেছিল।তখন তারা তাদেরকে সেকথাই বলে যা হযরত আবু মূসা তাদেরকে বলেছিলেন। (বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪৪১৫)

মহানবী (সা.)-এর কসম খাওয়ার কারণ কী বা কসমের গুরত্ব কী– এই বিষয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একটি তফসীরে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি (রা.) লেখেন: "এখানে একটি প্রশ্ন ওঠে যে, তাঁর (সা.) কাছে তো বাহন ছিলই না। তাহলে প্রশ্ন হলো, তিনি (সা.) কেন কসম খেয়ে বলেছিলেন, খোদার কসম! আমি তোমাদের বাহন দেবো না? পবিত্র কুরআন, হাদীস এবং ইতিহাস থেকে জানা যায়, প্রকৃতপক্ষে তাঁর (সা.) কাছে তখন কোনো বাহন ছিলই না। আর কসম খাওয়ার অর্থ হলো এমন কিছু থাকা সত্ত্বেও দিতে অস্বীকার করা। কেউ কি কখনো এই বলে শপথ করবে যে, আমি চাঁদে যাব না বা আমি সূর্যে যাব না? অথবা কেউ কি কসম খেয়ে বলতে পারে, আমি একবারে পুরো একটা হাতি গিলে ফেলব না? একইভাবে প্রশ্ন হলো, তাঁর (সা.) কাছে যেহেতু বাহনই ছিল না, সেক্ষেত্রে তিনি কেন শপথ করবেন? এর উত্তর হলো, অভদ্র ও শিক্ষাদীক্ষাহীন লোকেরা ততক্ষণ অন্যের কথায় বিশ্বাস করে না, যতক্ষণ সে শপথ নাকরে। আমার কাছে কখনো কখনো এমন লোকও আসে যারা বলে, আমাদের অমুক কাজটা করিয়ে দিন। আমিবলি, এ কাজ আমার সাধ্যের বাইরে। তখন তারা বলে, আপনি সব করতে পারেন! (তাদের ভাবটা এমন) যেন আমি কাজটি করতে পারি, কিন্তু মিথ্যা বলছি যে, পারি না। একইভাবে সেসব লোকও অভদ্র ও শিক্ষাদীক্ষাহীন ছিল। তারা সবে বয়আত করেছিল। আর মহানবী (সা.)-এর সত্যতা, মর্যাদা, মহত্ত্ব ও উন্নত নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না। তিনি (সা.) যখন তাদেরকে বলেন যে, আমার কাছে কোনো বাহননেই, তখন তারা ভেবেছিল, বাহন তো আছে, কিন্তু তিনি দিতে চাইছেন না। তাই তারা জোর দিয়ে বলে,আপনি তো বাদশা, আপনার কাছে বাহন না থাকার প্রশ্নই আসে না। উপরন্তু আরবদের স্বভাব ছিল, তারা কোনো কথায় ততক্ষণ আশ্বস্ত হয় না যতক্ষণ না কসম খাওয়া হয়। তারা সামান্য কথায়ও বলে ওঠে, ওয়াল্লাহে, বিল্লাহে, সুম্মা তাল্লাহে (অর্থাৎ আল্লাহ্র কসম)। ফলে তাদের বাহন চাওয়ার একগুঁয়েমি থামানোর একমাত্র উপায় ছিল তাঁর (সা.) কসম খাওয়া। তারা যেহেতু তাঁর (সা.) উত্তরকে অজুহাত ও বাহানা মনে করেছিল, তাই তিনি (সা.)তাদেরকে আশ্বস্ত করতে এবং বিষয়ের ইতি টানার জন্য কসম খান। তারা চলে যায়। পরবর্তীতে যখন বাহন আসে তখন তিনি (সা.) তাদেরকে ডেকে বাহন প্রদান করেন। অতএব ঐ শপথের অর্থ ছিল– আমার সময় নষ্টকোরো না। আর মহানবী (সা.)-এর এটি একটি অভিব্যক্তি ছিল মাত্র, মুখ থেকে তো আর উচ্চারণ করেন নি;কিন্তু প্রকাশভঙ্গি এমন ছিল যে, আমার সময় নষ্ট কোরো না এবং পীড়াপীড়ি কোরো না। আর বাহন দেবার কারণ হলো,এটি পুণ্য অর্জনের একটি মোক্ষম সুযোগ এবং তিনি (সা.) এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চান নি।" (আনওয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৮, পৃ: ৫৭১-৫৭২)

সূরা আত-তাওবার ৯২ নম্বর আয়াত আমি পূর্বেও তিলাওয়াত করেছি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ আয়াতের অধীনে বর্ণনা করেন,

وَّلَا عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَاۤ اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَاۤ اَجِدُ مَاۤ اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَّاَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ (التوبۃ:92)

"আর তাদের বিরুদ্ধেও (অভিযোগ) নাই, যারা তোমার কাছে এসেছিল যেন (জিহাদে যাবার জন্য) তুমি তাদের বাহনের ব্যবস্থা করে দাও। তুমি বলেছিলে, 'আমি কিছুই পাচ্ছি না যাতে আমি তোমাদের আরোহণ করাতে পারি।' তারা এই দুঃখে অশ্রুসজল নয়নে ফিরে যায় যে, (আল্লাহ্র পথে) ব্যয় করার মতো তাদের কিছুই ছিল না।" (সূরা তাওবা: ৯২)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লেখেন, এ আয়াতটি প্রায়োগিক দৃষ্টিকোণ থেকে সাধারণ অর্থে প্রযোজ্য হলেও এখানে বিশেষভাবে সাতজন দরিদ্র সাহাবীর কথা বলা হয়েছে যারা জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য অতি ব্যাকুল ছিলেন, কিন্তু হৃদয়ের এই বাসনা পূরণের সামর্থ্য তাদের ছিল না। তারা মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে অনুরোধ করেন, আমাদের জন্য কোনো বাহনের ব্যবস্থা করে দিন। মহানবী (সা.)বলেন, দুঃখের বিষয় হলো, আমি কোনো ব্যবস্থা করতে পারছি না। এতে তারা গভীরভাবে ব্যথিত হন, চোখ অশ্রুসিক্ত হয় আর তারা ফিরে যান। তিনি (রা.) বলেন, তাদের চলে যাবার পর হযরত উসমান (রা.) তিনটি উট দেন আর অন্য মুসলমানরা চারটি (উট) দেন। মহানবী (সা.) প্রত্যেককে একটি করে উট দিয়ে দেন। কুরআন এই ঘটনাটি এজন্য উল্লেখ করেছে যেন এই দরিদ্র সাহাবীদের সত্যিকারের নিষ্ঠা তাদের বিপরীতে তুলে ধরা যায় যারা ধনী হওয়া সত্ত্বেও ও সফরে যাওয়ার সামর্থ্যও থাকা সত্ত্বেও কিন্তু মিথ্যা অজুহাত খুঁজত। একদিকে দরিদ্রদের অবস্থা হলো তাদের মাঝে উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল, আবেগ-উচ্ছ্বাস ছিল এবং পূর্ণ ঈমান ছিল; অন্যদিকে ছিল সেসব সম্পদশালী লোক যারা নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করত ঠিকই, কিন্তু কপটতায় পরিপূর্ণ ছিল। এই আয়াত থেকে এটিও বুঝা যায়, যারা মদীনায় রয়ে গিয়েছিল– তাদের সবাই মুনাফিক ছিল না; বরং কারো কারো কাছে (যুদ্ধের) উপকরণ না থাকায় পেছনে রয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন; তাদের মাঝে এমন নিষ্ঠাবান মুসলমানও ছিলেন যারা কেবল যুদ্ধযাত্রার উপায়-উপকরণ না থাকার কারণে যেতে পারেন নি।" [তফসীর সূরা তওবা, আয়াত: ৯২, (অপ্রকাশিত)]

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন: "আমরা সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করতে যাচ্ছি– মহানবী (সা.)-এর এই ঘোষণার পর মুসলমানরা নিষ্ঠা এবং আবেগ-উচ্ছ্বাস নিয়ে কুরবানীর ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করছিলেন। দরিদ্র মুসলমানরা যুদ্ধসামগ্রী কোথায় পাবে! তাদের কাছে কিছুই ছিল না। রাষ্ট্রীয় কোষাগারও তখন শূন্য ছিল। তাদের স্বচ্ছল ভাইয়েরাই কেবল তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসতে পারত। মোটকথা, প্রত্যেকে কুরবানীর ক্ষেত্রে একে অপরের চেয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। হযরত উসমান (রা.) সেদিন তাঁর অর্থের বেশিরভাগ পরিমাণ মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থাপন করেন, যা এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা ছিল। [মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যখন বর্ণনা করেছিলেন তখনকার হিসেবে এর মূল্য ছিল পঁচিশ হাজার রুপি, আর বর্তমানে তো এর মূল্যমান লক্ষ লক্ষ টাকা হবে।] এভাবে সাহাবীরা নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী চাঁদা জমা করেন এবং দরিদ্র মুসলমানদের জন্য বাহন,

যুগ খলীফার বাণী

জাগতিক কামন-বাসনা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এটি এড়িয়ে চলা আবশ্যক।

(খুতবা জুমআ, ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam Master, Nararvita (Assam)**

যুগ খলীফার বাণী

খিলাফত এবং জামাতের সঙ্গে যারা সম্পর্ক স্থাপন করে, আল্লাহ তা'লা তাদের পথ-প্রদর্শন করেন।

-খুতবা জমা ২৪ মে ২০১৯

দোয়াপ্রার্থী: **Noor Jahan Begum, Kolkata**

তরবারি কিংবা বর্শা ইত্যাদি সরবরাহ করেন। সাহাবীদের মাঝে কুরবানীর স্পৃহা এত অধিক পরিমাণ ছিল যে, ইয়েমেনের কিছু লোক যারা ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় হিজরত করেছিল এবং অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থায় ছিল, তাদের কয়েকজন মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয় এবং বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাদেরকেও আপনার সাথে নিয়ে চলুন। আমরা আর কিছুই চাই না। আমরা শুধু এতটুকু চাই যে, আমাদেরকে সেখানে পৌঁছানোর উপকরণ দেওয়া হোক। পবিত্র কুরআনে এসব লোক সম্পর্কে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যেমনটি প্রথমে তিলাওয়াত করা হয়েছে যে,

وَّلَا عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَاۤ اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَاۤ اَجِدُ مَاۤ اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَّاَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ (التوبۃ:92)

অর্থাৎ এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার জন্য তাদের কোনো পাপ হবে না। তারা তোমার নিকট এজন্য এসেছিল যেন তুমি তাদের জন্য এমন উপকরণের ব্যবস্থা করো যার সাহায্যে তারা সেখানে পৌঁছাতে পারে। কিন্তু তুমি তাদের বলেছ, তোমাদের সেখানে পৌঁছে দেবার মতো কোনো উপকরণ আমার কাছে নেই। তখন তারা তোমার বৈঠক থেকে উঠে চলে যায় আর তাদের চোখ থেকে তখন এই কষ্টে অশ্রু ঝরছিল যে, হায়! তাদের কাছে কোনো সম্পদ নেই যা তারা ইসলামের সেবার জন্য ব্যয় করতে পারে। (সূরা তাওবা: ৯২)আবু মূসা তাদের নেতা ছিলেন। যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, আপনারা মহানবী (সা.)-এর নিকট তখন কী চেয়েছিলেন? তখন তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা উট বা ঘোড়া চাই নি। আমরা শুধু বলেছিলাম, আমাদের পা নগ্ন, আমাদের পায়ে জুতোও নেই। খালি পায়ে এত দীর্ঘ পথ আমাদের পক্ষে অতিক্রম করা সম্ভব ছিল না। যদি শুধুমাত্র এক জোড়া জুতা আমাদের দেওয়া হতো, তাহলে আমরা জুতা পরে দৌড়ে দৌড়ে গিয়েই আমাদের ভাইদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য পৌঁছে যেতাম। (দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনেয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ৩৬০-৩৬১) এতটা আন্তরিকতা ছিল তাদের!

এই যুদ্ধে যাবার সময় মদীনায় প্রতিনিধি নিযুক্ত করা সম্পর্কে লেখা আছে, তাবুকের যুদ্ধের প্রাক্কালে মহানবী (সা.) মদীনায় কয়েকজন সাহাবীকে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছিলেন। এ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা বিদ্যমান। একটি বর্ণনা অনুযায়ী, মহানবী (সা.) মদীনায় হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-কে তাঁর আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। এছাড়াও হযরত সিবাহ বিন উরফাতা (রা.), হযরত আলী (রা.) এবং হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উম্মে মাকতুম (রা.)-র নামও পাওয়া যায়।(আসসীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৮৫)

ভিন্ন ভিন্ন এসব রেওয়ায়েতকে যদি সমন্বয় করার চেষ্টা করা হয়, অর্থাৎ কীভাবে এগুলোর মাঝে পরস্পর সামঞ্জস্য বিধান করা যায়; চার ব্যক্তির নাম যে পাওয়া যায়- এসব বর্ণনা প্রকৃতপক্ষেই সত্য কিনা তা কীভাবে বুঝব? এর একটি উপায় হলো, এই চার ব্যক্তিকেই স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করা হয়েছিল, কিন্তু তাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব ভিন্ন ভিন্ন ছিল। হযরত আলী (রা.)-র দায়িত্ব ছিল মহানবী (সা.)-এর পরিবারের দেখাশোনা করা। হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) ছিলেন মদীনাবাসীর সাধারণ বিষয়াদির দেখাশোনার দায়িত্বে । আর হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উম্মে মাকতুম (রা.)-র দায়িত্ব ছিল নামাযের ইমামতি করা। হযরত সিবাহ বিন উরফাতা (রা.)-কে প্রথমে মদীনার সার্বিক তত্ত্বাবধানের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল, কিন্তু এরপর হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-কে তার স্থলে মনোনীত করা হয়। (শারাহ যুরকানি, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৮১) [দায়েরায়ে মারেফ সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.), পৃ: ৪৮০]

যেহেতু এটি একটি দীর্ঘ যাত্রা ছিল, এজন্য মহানবী (সা.) তাঁর পরিবারের খোঁজখবর নেবার জন্য এবং তাঁর পরিবারের প্রয়োজনাদি পূরণের জন্য হযরত আলী (রা.)-কে মদীনায় অবস্থান করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। মুনাফিকরা- যাদের একমাত্র কাজ ছিল ঠাট্টাবিদ্রুপ করা, তারা হযরত আলী (রা.)-কে মদীনায় রেখে যাবার কারণে তির্যক সমালোচনা করতে শুরু করে যে, (নাউযুবিল্লাহ্) তিনি (রা.) নাকি মহানবী (সা.)-এর জন্য বোঝা ছিলেন, যেকারণে তিনি (সা.) তাঁকে নিজের সাথে নেন নি। এসব বিদ্রুপাত্মক কথা শুনে অথবা চারপাশে মুনাফিকদের আচরণ দেখে হযরত আলী (রা.) স্বয়ং বিচলিত হয়ে যুদ্ধাস্ত্রসহ মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন। মহানবী (সা.) তখনো মদীনা থেকে তিন কিলোমিটার দূরে জুরফ নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। হযরত আলী (রা.) নিজের উদ্‌বেগ ও অস্বস্তির কথা উল্লেখ করে নিবেদন করেন, আপনি আমাকে নারী ও শিশুদের মাঝে রেখে এসেছেন (অথচ) আমি শক্তিশালীও, (এবং যুদ্ধ করার) যোগ্যতাও রাখি। এতে মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.)-র মনজয় করতে গিয়ে এমন একটি কথা বলেন যা হযরত আলী (রা.)-র মহত্ত্ব ও মর্যাদাকে পরম উন্নত মানে উপনীত করে। মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে সম্বোধন করে বলেন,

اَلَا تَرْضٰى اَنْ تَكُوْنَ مِنِّيْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسٰى اِلَّا اَنَّهٗ لَيْسَ نَبِيٌّ بَعْدِيْ

অর্থাৎ হে আলী! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তোমার সাথে আমার সেরূপ সম্পর্ক থাকবে যেমনটি ছিল হারূনের সাথে মূসার? কিন্তু (পার্থক্য হলো) আমার পরে তুমি নবী নও। অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.) যখন তূর পর্বতে আরোহণ করেন, তখন তাঁর অবর্তমানে হারূন (আ.) ছিলেন হযরত মূসা (আ.)-এর স্থলাভিষিক্ত, তিনি নবীও ছিলেন। তুমিও আমার স্থলাভিষিক্ত হবে, কিন্তু তুমি নবী হবে না।(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪৪১৬)

তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুসলমানদের সংখ্যা সম্পর্কে উল্লেখ হয়েছে, মহানবী (সা.) যুদ্ধের বাহ্যিক সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করার পর দোয়ার প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং প্রস্তুতির শুরু থেকে তাবুকের উদ্দেশ্যে যাত্রা আরম্ভ করা পর্যন্ত এই দোয়া করতে থাকেন, اَللّٰهُمَّ اِنْ تُهْلِكْ هٰذِهِ الْعِصَابَةَ فَلَنْ تُعْبَدَ فِي الْأَرْضِ অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক-প্রভু! যদি এই ছোট্ট দলটি (আজ) ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে পৃথিবীতে তোমার ইবাদত করার কেউ থাকবে না।

এটি একটি অদ্ভুত কাকতালীয় ঘটনা যে, মহানবী (সা.)-এর প্রথম যুদ্ধাভিযান, অর্থাৎ বদরের যুদ্ধের প্রাক্কালে এবং তাঁর (সা.) জীবনের শেষ যুদ্ধাভিযানের প্রাক্কালেও এই একই দোয়া করার উল্লেখ পাওয়া যায়।

(আল মুজামুল কবীর লিতিবারানী, খণ্ড-১৮, পৃ: ২৩১-২৩২) (কুনযুল উম্মাল, ৭ম খণ্ড, পৃ: ১৩, পৃ: ১৮) (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, খণ্ড-৫, পৃ: ৪৩৪)

যাইহোক, প্রচণ্ড গরমের মৌসুমে দীর্ঘ যাত্রা এবং অন্যান্য অনেক সমস্যা আর মুনাফিকদের অপপ্রচার সত্ত্বেও ত্রিশ হাজারের একটি বিশাল সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। এতে দশ হাজার অশ্বারোহী ছিল। মহানবী (সা.)-এর জীবনের অন্যান্য সকল যুদ্ধাভিযানের তুলনায় এটি ছিল বৃহত্তম সৈন্যবাহিনী। সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা বিভিন্ন রেওয়ায়েতে ভিন্ন ভিন্ন উল্লেখ করা হয়েছে। একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী চল্লিশ হাজার এবং অপর এক রেওয়ায়েতে সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ৭০ হাজারও উল্লেখ করা হয়েছে। মহানবী (সা.)-এর সাথে দশ হাজার ঘোড়া ছিল, অথবা কারো কারো মতে বারো হাজার ঘোড়া ছিল।

ত্রিশ হাজার সংখ্যাতেই ঐতিহাসিকদের ঐকমত্য রয়েছে। অধিকাংশ ঐতিহাসিকই ত্রিশ হাজার সংখ্যাটিকে সঠিক বলেছেন। আর এটি একটি অনুমান মাত্র, কেননা সেই সময় মুজাহিদদের গণনার জন্য কোনো রেজিস্টার বা রেকর্ড বই ইত্যাদি কিছু ছিল না, যেমনটি খিলাফতে রাশেদার যুগে এই (মুজাহিদদের গণনার জন্য রেজিস্টার খাতার) ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল। (আসসীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৮৫)

মহানবী (সা.) আনসার এবং আরব গোত্রগুলোকে 'লিওয়া' অর্থাৎ ছোটো পতাকা কিংবা 'রায়া' তথা বড়ো পতাকা বানানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। মহানবী (সা.) তাবুকের যুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো পতাকা হযরত আবু বকর (রা.)-কে প্রদান করেন। এছাড়াও হযরত যুবায়ের, হযরত উসায়েদ বিন হুযায়ের, হযরত আবু দুজানা অথবা কতক রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত হুবাব বিন মুনযের (রা.)-কে ছোটো পতাকা প্রদান করা হয়েছিল।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৮৬) (শারাহ যুরকানি, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৮৩) (আল লউলুল মাকনুন, সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৪৭৫)

সেই যুগে কোনো কাফেলা বের হবার সময় কোনো না কোনো গাইড অবশ্যই সাথে রাখা হতো যারা রাস্তা সম্পর্কে খুব ভালোভাবে জানত। এই গাইড নির্ধারণ করার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে, তাবুকের যুদ্ধের সময় মহানবী (সা.) গাইড হিসেবে আলকামা বিন ফাগওয়া খুযায়ী এবং তার পিতাকে মনোনীত করেছিলেন, যারা রাস্তা সম্পর্কে খুবই ভালোভাবে জ্ঞাত ছিলেন আর সঠিক পথে দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছে দিতে পারতেন। (শারাহ যুরকানি, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৮৪)

হযরত কা'ব বিন মালিক বর্ণনা করেন, তাবুকের যুদ্ধের জন্য মহানবী (সা.) বৃহস্পতিবার যাত্রা করেন এবং তিনি (সা.) বৃহস্পতিবার সফর করা পছন্দ করতেন। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, হাদীষ-২৯৫০)

সাধারণ রীতি আনুযায়ী মদীনা থেকে অল্প দূরত্বে সানিয়াতুল বিদা নামক স্থানে লোকেরা সমবেত হতে থাকে, আর সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে রসূলুল্লাহ্ (সা.) মদীনা থেকে তাবুকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুলও তার মুনাফিকীর শেষ অস্ত্র হিসেবে একটি সৈন্যদল নিয়ে সানিয়াতুল বিদার নীচের দিকে যুবা পাহাড়ের পাদদেশে শিবির স্থাপন করেছিল। সে এমন ভাব দেখাচ্ছিল যে, সেও মুসলমানদের সাথে তাবুকের যুদ্ধে যাবার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু মহানবী (সা.) সৈন্যবাহিনীকে যাত্রার নির্দেশ দিতেই আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই এ কথা বলে নিজের সৈন্যদলসহ

যুগ ইমামের বাণী

সেই সময় দূর নয় বরং অতি নিকটেই যেদিন তোমরা আকাশ থেকে ফিরিশতাদের ফৌজ এশিয়া ,ইউরোপ ও আমেরিকার মানুষের মনে অবতীর্ণ হতে দেখবে। (ফতেহ ইসলাম, রূ-খা, খণ্ড-৩, পৃ: ১২)

দোয়াপ্রার্থী: Sayen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

মদীনায় ফেরত চলে আসে– এই মুসলমানরা রোমানদের সাথে যুদ্ধকে ছেলেখেলা ভাবছে! এই কথা বলে সে ফেরত চলে যায় যে, এটা কোনো ছেলেখেলা নয়; রোমান সাম্রাজ্য একটি বিশাল সাম্রাজ্য! এটিও বলা হয় যে, তার সৈন্যদল বেশ বড়ো ছিল। সে বলে, এত প্রচণ্ড গরম এবং এমন পরিস্থিতে এত দূরের সফর কোনো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। সে বলতে থাকে , আমি তো মুহাম্মদ (সা.)-র সাথিদেরকে রোমানদের হাতে বন্দি হতে দেখতে পাচ্ছি। এ কথা বলে সে ফেরত চলে যায় আর (তার) উদ্দেশ্য ছিল– হয়ত এতে মুসলমানদের মনোবল ভেঙে পড়বে, আর তার ধারণা অনুসারে হয়ত কিছু মুসলমান মহানবী (সা.)-এর সঙ্গ পরিত্যাগ করবে। কিন্তু সে চিরাচরিতভাবে ব্যর্থ ও অকৃতকার্য হয়েই ফেরত গিয়েছে। সে উহুদের যুদ্ধেও এমনটি করেছিল। তখনও সে মুসলিম বাহিনীর সাথে খানিকটা পথ গিয়েছিল ,অতঃপর পথিমধ্যে তার তিনশ সাথিকে নিয়ে ফেরত চলে গিয়েছিল। যদিও মুসলিম সেনাদলের সর্বমোট সংখ্যা ছিল এক হাজার আর এরপর (শুধুমাত্র) সাতশ রয়ে গিয়েছিলেন। আর এটি (তথা তাবুকের যুদ্ধের মুসলিম বাহিনী) তো অনেক বড়ো সেনাবাহিনী ছিল।

(তারিখুত তাবারি, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৮২) (শারাহ যুরকানি, ৪র্থ খণ্ড,পৃ: ৮৪)

যাইহোক, এ-ও উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন ক্রীতদাস তার মনিবের অনুমতি ছাড়াই এ যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য এসে পড়ে। মহানবী (সা.) এই বিষয়টি জানতে পেরে (মনিবের) অনুমতি ছাড়া অংশগ্রহণকারী দাসকে ভর্ৎসনা করেন। এর বিস্তারিত বিবরণে লেখা আছে, মহানবী (সা.) সানিয়াতুল বিদায় শিবিরে অবস্থানকালে একজন সশস্ত্র দাসকে দেখতে পান, যে তার (মহিলা) মনিবের অনুমতি ছাড়াই চলে এসেছিল। মহানবী (সা.) তাকে বলেন, তুমি তোমার (মহিলা) মনিবের কাছে ফেরত চলে যাও। [তিনি (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, অনুমতি নিয়েছ? সে বলে, জি না; তিনি (সা.) বলেন, ফেরত চলে যাও।] মহানবী (সা.) আরো বলেন, আমাদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ কোরো না। তুমি যদি যুদ্ধে মারা যাও তবে জাহান্নামে যাবে। (শারাহ যুরকানি, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৮৩-৮৪)

[অর্থাৎ তোমার ঈমানের দাবি হলো, মনিবের অনুমতি নেওয়া আবশ্যক।]

যাইহোক, এই যুদ্ধের অবশিষ্ট বিবরণ আগামীতে বর্ণনা করব, ইনশাআল্লাহ্।

এখন কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণও করতে চাই যাদের জানাযার নামায পরবর্তীতে পড়াবো।প্রথম স্মৃতিচারণ হচ্ছে জনাব গোলাম মু হীউদ্দীন সুলায়মান সাহেবের যিনি ইন্দোনেশিয়ার মুরব্বী সিলসিলাহ্ ছিলেন। তিনি সম্প্রতি সাতষট্টি বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ১৯৩২ সালে তার দাদা হাজী দামিনী সাহেব মওলানা রহমত আলী সাহেবের হাতে বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। মরহুম প্রাথমিক পড়ালেখা শেষ করার পর উচ্চশিক্ষার জন্য রাবওয়ায় চলে যান এবং সেখানে তিনি জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়ার ফাসলুল খাস-এ ভর্তি হবার সুযোগ লাভ করেন। ১৯৮৫ সালের জুলাই মাসে তিনি সেখান থেকে শাহাদাতুল আজানিব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইন্দোনেশিয়ায় ফিরে যান। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর যুগে তিনি উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি (রাহে.) তাকে ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা ও সেখানকার বিভিন্ন শহরে নিযুক্তি প্রদান করেন আর তিনি আঞ্চলিক মুবাল্লেগ হিসেবে কাজ করতে থাকেন। অনুরূপভাবে তিনি কেন্দ্রীয় কমিটিসমূহেরও সদস্য ছিলেন। তিনি মোটামুটি চল্লিশ বছর কাজ করার সুযোগ লাভ করেছেন। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে দুই পুত্র ও এক কন্যা রয়েছেন।

তার এক পুত্র মুসলেহ্ উদ্দীন এহসান সাহেব মুরব্বী সিলসিলাহ্ এবং তিনিও সেখানেই সেবা করার সুযোগ পাচ্ছেন। তার সব আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব তার সম্পর্কে এ কথাগুলো বলেছেন যে, তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, সাদাসিধে ও খুবই বন্ধুবৎসল মানুষ ছিলেন। নিজ জীবন সর্বদা ধর্মের সেবা, আহমদীয়া জামা'ত ও অন্যের হিতসাধনের জন্য উৎসর্গ করে রেখেছিলেন। তার মাঝে খুবই উন্নতমানের বিনয়, নম্রতা ও নিয়মানুবর্তিতার বৈশিষ্ট্য ছিল। তার সাথে যে-ই মিশতেন তিনিই তার নিষ্ঠা, সাদাসিধে ব্যবহারে প্রভাবান্বিত না হয়ে পারতেননা। তালীম ও তরবিয়ত সংক্রান্ত বিষয়ে তার সেবাসমূহ উল্লেখযোগ্য। তিনি সর্বদা জ্ঞানের পাশাপাশি নৈতিকতাকে গুরুত্ব প্রদান করেছেন এবং সর্বদা এ বিষয়ে চিন্তিত থাকতেন যে, নতুন প্রজন্মকে উত্তম চরিত্র ও ঈমানে সুসজ্জিত করা উচিত। তবলীগের কাজেও তিনি মনেপ্রাণে ভূমিকা রেখেছেন এবং সর্বদা নিষ্ঠা, গাম্ভীর্য ও ভালোবাসার সাথে নিজ বাণী পৌঁছিয়েছেন। খিলাফতের সাথে তার গভীর সম্পর্ক ছিল। তার বিশ্বস্ততা অনুকরণীয় ছিল। আল্লাহ্‌র ওপর ভরসাকারী একজন মানুষ ছিলেন। অন্তিম দিনগুলোতে তিনি অত্যন্ত ধৈর্য ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছেন। অসুস্থ অবস্থায় কোনো অভিযোগ-অনুযোগ তার মুখে উচ্চারিত হয় নি, বরং সর্বদা কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি দয়া ও ক্ষমাসুলভ আচরণ করুন।

দ্বিতীয় জানাযা ও স্মৃতিচারণ জনাব ড. মুহাম্মদ শফিক সেহগাল সাহেবের। তিনি মুলতানের জেলা আমীরও ছিলেন, পরবতীতে রাবওয়ায় তাহরীকে জাদীদের সহকারী ওয়াকীলুত্ তাসনীফ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি সম্প্রতি মৃত্যুবরণ করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মরহুম আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মূসী ছিলেন। তিনি তার অবর্তমানে তিন পু ত্রসন্তান রেখে গেছেন। তার বংশে আহমদীয়াতের সূচনা তার পিতা জনাব মরহুম মিয়াঁ মুহাম্মদ উমর সেহগাল সাহেবের মাধ্যমে হয়েছিল যিনি দ্বিতীয় খলীফার যুগে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি একজন পিএইচডি ডক্টর ছিলেন। তিনি মেট্রিক পাশ করার পর জীবন উৎসর্গ করে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-র নিকট নিজেকে উপস্থাপন করেন। খলীফা সানী (রা.) তাকে বলেন, শিক্ষা অর্জন করো। সে-সময় ফযলে উমর রিসার্চ সেন্টার নির্মাণ করার পরিকল্পনা চলছিল। যাহোক, তার বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশোনা করার আগ্রহ ছিল। তিনি প্রথমে রসায়নবিদ্যায় এমএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীতে যুক্তরাজ্যথেকে রসায়বিদ্যায় পিএইচডি করেন। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী এক শিক্ষকের ছাত্র হওয়ার সম্মানে তিনি সম্মানিতছিলেন। যাহোক, যখন তিনি চলে আসেন তখন তাৎক্ষণিকভাবে তো রিসার্চ ইন্সটিটিউট নির্মিত হতে পারে নি , এজন্য হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাকে সেখানে কাজে লাগান নি এবং তার অবসর সময়ই কাটছিল। তখন তার পিতা বলেন, যতদিন তিনি জামা'তের কাজে লাগছেন না ততদিন তাকে আমার সাথে ব্যাবসায় সাহায্য করার অনুমতি প্রদান করুন। সুতরাং তিনি তার পিতার সাথে ব্যাবসায় অংশগ্রহণ করেন, কিন্তু এর পাশাপাশি বিভিন্ন ভাবে জামা'তের সেবা করারও তার সুযোগ হয়েছিল। প্রায় চৌদ্দ থেকে পনেরো ব ছর মুলতানের জেলা আমীর হিসেবে সেবা করার সুযোগ লাভ করেন। এভাবে তিনি ফুরকান ফোর্সেও অংশগ্রহণ করেন। খলীফতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-র যুগে কোলকাতায় দুটি পরিবারের মধ্যে দীর্ঘ বিবাদ চলে আসছিল আর তারা তার আত্মীয়ও ছিল। তখন খলীফাতুল মসীহ্ রাবে তাকে একটি তদন্ত কমিশনের দায়িত্ব দিয়ে সেখানে প্রেরণ করেন। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সেই সমস্যার সমাধান করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, আমি জানি, আপনি আত্মীয়তার উর্ধ্বে থেকে সততার সাথে সিদ্ধান্ত দেবেন। বাস্তবে পরবর্তীতে এমনটিই হয়েছে। ১৯৯১ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে-র নির্দেশে তিনি উগান্ডায় একটি তেলের মিল স্থাপনের কাজে যান এবং নিজ তত্ত্বাবধানে সেখানে তেলের মিল স্থাপন করেন। এভাবে আফ্রিকার আরো তিনটি দেশে এবং ইউরোপের একটি দেশে তাকে কিছু দায়িত্ব দেওয়া হয় যা তিনি সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন। মুলতানে তার অনেক বড়ো ভোজ্য তেলের কারখানা ছিল। নিজের ব্যবসা করলেও তার মধ্যে সর্বদা এই চেতনাবোধ জাগ্রত ছিল যে, আমি একজন ওয়াকেফে যিন্দেগী; আর তিনি নিজ ব্যাবসাবাণিজ্যের ব্যস্ততাকেও জামা'তের কাজের স্বার্থে গৌণ বিষয় হিসেবে দেখতেন।

যাইহোক, ২০০৩ সালে তিনি আমাকে লেখেন, এখন আমি ওয়াকফ করতে চাই, অবশিষ্ট জীবন সেবা করতে চাই। সুতরাং আমি তাকে তাহরীকে জাদীদের সহকারী ওয়াকীলুত্ তাসনীফ হিসেবে নিযুক্ত করি। তিনি শিক্ষিত ছিলেন, তার ইংরেজীও ভালো ছিল এবং ধর্মীয় জ্ঞানও রাখতেন, তাই সেই দায়িত্ব তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পালন করেন।

তার ছেলে মাহমুদ সেহগাল সাহেব লেখেন, তিনি একটি কর্মময়, সার্থক ও ইবাদতে সজ্জিত জীবন অতিবাহিত করার সুযোগ লাভ করেছেন। কুরআন করীম পাঠ এবং কুরআনের বিষয়সমূহের ওপর প্রণিধান করা তার একটি বিশেষ গুণ ছিল। তার মৃত্যুতে অধিকাংশ সমবেদনা প্রকাশকারীরা এই মন্তব্য করেছেন যে, তার প্রকৃতিতে কোমলতা ছিল আর তিনি ভালোবাসা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতাপূর্ণ একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন, স্নেহপরায়ণ একজন মানুষ ছিলেন। তার পরামর্শ ও তরবিয়তের রীতি ছিল খুবই সুন্দর। তিনি বলেন, আমাদেরকেও সর্বদা জামা'তের ব্যবস্থাপনার আনুগত্যের জন্য উপদেশ দিতেন আর বলতেন, যদি সংশোধনীয় কোনো বিষয় দেখতে পাও তবে নিজেদের মতামত শুধু উপযুক্ত স্থানেই প্রদান করবে, যত্রতত্র কথা বলবে না। সবসময় বলতেন, তোমরা অন্যদের দিকে দেখো না, কর্মকর্তাদের দিকে দেখো না। তোমরা যুগ-খলীফার হাতে বয়আত করেছ। সুতরাং এই কথা মনে রেখো, আমরা যে কাজই করি না কেন– তা যুগ-খলীফার অনুসরণে করব আর তঁ ার সাথে কৃত বিশ্বস্ততার অঙ্গীকার পূর্ণ করব। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন।

তৃতীয় স্মৃতিচারণ হচ্ছে শ্রদ্ধেয়া বুশরা পারভেজ মিনহাজ সাহেবার। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের পারভেজ মিনহাজ সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। তিনিও সম্প্রতি মৃত্যুবরণ করেছেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি করীম নগর নুসরাতাবাদে জামা'তের যে ফার্ম ছিল– সেটির প্রাক্তন ম্যানেজার চৌধুরী ফযল আহমদ সাহেবের মেয়ে ছিলেন আর বিয়ের পূর্বেও তিনি হায়দ্র াবাদের সিন্ধুতে লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র অনেক সেবা করেছেন। এরপর তিনি যখন রাওয়ালপিন্ডিতে ছিলেন, সেখানেও তিনি সেবা করার সুযোগ লাভ করেছেন এবং হায়দ্রাবাদ পিন্ডিতে লাজনার প্রেসিডেন্ট

(খুতবার শেষাংশ ১২ পাতায়.....)

জুমআর খুতবা

আজকের সমাজ–যা পাশ্চাত্য প্রবণতা বা কথিত উদার মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত–(যদিও অস্ট্রেলিয়া ভূগোলগতভাবে পশ্চিমা দেশ নয়, তবুও এর মানুষেরা পশ্চিমা দেশ থেকে এসেছে এবং এটি একটি স্বাধীন সমাজ), 'স্বাধীনতা'র নামে বহু অদ্ভুত রীতি গড়ে উঠেছে। বিবাহের বহু আগেই নারী–পুরুষের মধ্যে এমন রকম যোগাযোগ সৃষ্টি হয় যা স্বাধীনতার নাম নিয়ে অশ্লীলতার দিকে নিয়ে যায়। ইসলাম এটিকে নিষিদ্ধ করেছে।

তাকওয়া থেকে দূরে সরে গেলে মানুষ অন্যদের অনুকরণ করতে শুরু করে। আর যদি তাকওয়া অন্তরে থাকে, তবে কখনোই মনে হবে না যে দুনিয়াবি স্বাধীনতা উত্তম এবং তা গ্রহণযোগ্য। স্বাধীনতার সীমা আছে; সীমাহীন স্বাধীনতা ইসলাম অনুমতি দেয় না।

এ হতে পারে না যে কেউ আল্লাহতে ঈমান রাখে, অথচ তাঁর নির্দেশ অমান্য করে। যদি কেউ সত্যই সর্বশক্তিমান আল্লাহতে বিশ্বাস করে, তবে তাকে অবশ্যই নিজের আগামী দিনের ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। আল্লাহ তোমাদের তোমাদের 'আগামী দিনের' প্রতি লক্ষ্য রাখতে বলেছেন; নচেত আমল নিষ্ফল। মৃত্যুর পর কেবল আল্লাহর উদ্দেশে করা কাজই কাজে আসবে। প্রত্যেকে দেখুক তার প্রতিটি কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, না নিছক দুনিয়াবি প্রদর্শনের জন্য।

একজন নারী তার ঘরের রক্ষক। হাদিসে এসেছে নারী তার পরিবারের রক্ষক। যদি সে নিজে সালাত, কুরআন তিলাওয়াত ও দ্বীন শেখার প্রতি যত্নবান হয়, তবে সন্তানরাও এসব বিষয়ে মনোযোগী হবে। কিছু নারী অভিযোগ করে তাদের স্বামী ধর্মীয় কর্তব্যে মনোযোগ দেয় না। যদি তা সত্য হয়, তবে তাদের স্মরণ করিয়ে দাও; এটিও তোমাদের দায়িত্ব। যথাযথ সময়ে, যথাযথ ভঙ্গিতে তাদের বলো যে তাদের অবহেলা কেবল নিজেদের জন্য ক্ষতিকর নয়, বরং পরবর্তী প্রজন্মকেও বিপথে নিয়ে যায়।

আজকাল চলচ্চিত্র যুবকদের মনে অশ্লীলতা সৃষ্টিতে বড় ভূমিকা রাখছে–যদিও অভিযোগ আছে কিছু প্রাপ্তবয়স্ক, বিশেষত পুরুষদের সম্পর্কেও। ঘর ভেঙে যাচ্ছে কারণ মানুষ টিভি বা ইন্টারনেটে অশালীন চলচ্চিত্র দেখে সময় নষ্ট করছে। স্বাধীনতার নামে অশ্লীলতা সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে। এসব চলচ্চিত্র কখনোই পবিত্র চিন্তা সৃষ্টি করতে পারে না।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) অস্ট্রেলিয়া সফর (২০১৩)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

তাশাহ্হুদ, তাউয্?, তাসমিয়াহ এবং সূরা ফাতিহা তিলাওয়াতের পর হুজূর আনোয়ার (আয়্যাদাহুল্লাহু তা'আলা বিনসরিহিল আজীজ) বললেন:

এই অধিবেশনের শুরুতে তোমাদের সামনে যে কুরআন মাজীদের আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়েছে, তোমাদের মধ্যে কিছু বোন জানো যে ঐ আয়াতগুলোর একটি নিকাহ্ অনুষ্ঠানে প্রচলিতভাবে পাঠ করা হয়। সূরা হাশরের যে আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়েছে, তার মধ্যে প্রথম আয়াতটি–প্রচলিত ধারাবাহিকতার ভিত্তিতে–নিকাহ্? অনুষ্ঠানে পাঠ করা বিভিন্ন কুরআনিক আয়াতের মধ্যে শেষ আয়াত হিসেবে পড়া হয়। তোমরা তার অনুবাদেও শুনেছ যে আল্লাহ তাআলা তাকওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং মুমিনদের তাদের আগামী দিনের প্রতি সচেতন থাকতে বলেছেন। তাকওয়া এমন এক গুণ, যা অন্তরে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষকে সৎকর্ম সম্পাদনের ক্ষমতা দান করা হয়। প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) এ বিষয়ে ওহি লাভ করেছিলেন: "যদি এই মূলটি থাকে, তবে সবই থাকে।" প্রথম পঙ্?ক্তিটি প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) নিজেই রচনা করেছিলেন:

"প্রত্যেক নেকির মূল হলো তাকওয়া।"

এর পরপরই তিনি দ্বিতীয় পঙ্ক্তিটি ওহিরূপে লাভ করেন:

"যদি এই মূলটি থাকে, তবে সবই থাকে।"

হুজূর (আ.) বললেন: মানুষের জীবনে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হলো সেই মুহূর্ত, যখন সে এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করে, যেখানে নারী ও পুরুষ উভয়েরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে–যাকে বলা হয় বিবাহের বন্ধন। বিবাহ একটি অত্যন্ত গুরুত্ববহ উপলক্ষ। তা সে দুনিয়াদার হোক, কোনো ধর্মের অনুসারী হোক, ধর্মহীন হোক, এমনকি আল্লাহকে না–মানা ব্যক্তি হলেও–বিবাহ তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু একজন ব্যক্তি, যিনি ইসলামের শিক্ষার অনুসরণে উদ্বিগ্ন, তার কাছে বিবাহের তাৎপর্য দুনিয়াদার মানুষের বিবাহের মতো নয়, কারণ দুনিয়াদাররা বিবাহকে দুনিয়াবি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করে।

হুজূর (আ.) বললেন: আজকের সমাজ–যা পাশ্চাত্য প্রবণতা বা কথিত উদার মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত–(যদিও অস্ট্রেলিয়া ভূগোলগতভাবে পশ্চিমা দেশ নয়, তবুও এর মানুষেরা পশ্চিমা দেশ থেকে এসেছে এবং এটি একটি স্বাধীন সমাজ), 'স্বাধীনতা'র নামে বহু অদ্ভুত রীতি গড়ে উঠেছে। বিবাহের বহু আগেই নারী–পুরুষের মধ্যে এমন রকম যোগাযোগ সৃষ্টি হয় যা স্বাধীনতার নাম নিয়ে অশ্লীলতার দিকে নিয়ে যায়। ইসলাম এটিকে নিষিদ্ধ করেছে। এ ধরনের বন্ধুত্ব বা সম্পর্ক গড়ে তোলা, এবং এখানে প্রচলিত সাংস্কৃতিক ধারা কখনও কখনও আমাদের নিজস্ব মেয়েদেরও প্রভাবিত করে, যারা বলে, "আমাদের মধ্যে এখনো বোঝাপড়া তৈরি হয়নি।" এসব ধারণা ভুল। রাসূলুল্লাহ (সা.) যে পুরুষদের নতুন জীবন শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন তা হলো–সম্পদ নয়, বংশীয় মর্যাদা নয়, সৌন্দর্য নয়–যদি কোনো কিছুকে অগ্রাধিকার দিতেই হয়, তবে একজন নারীর তাকওয়া ও ধর্মপরায়ণতাকে অগ্রাধিকার দাও।

হুজূর (আ.) বললেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) যে কুরআনিক আয়াতসমূহকে গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষে পাঠের জন্য বাছাই করেছেন, তার মধ্যে নিকাহ্? অনুষ্ঠানের আয়াতসমূহ অন্যতম। কেননা বিবাহ মানুষের জীবনের এক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এই পবিত্র বন্ধনের ঘোষণার সময় যে আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়, সেখানে পাঁচবার তাকওয়ার উল্লেখ এসেছে। অতএব নারী–পুরুষের বন্ধন কেবল দুনিয়াবি চাহিদা পূরণের জন্য নয়; বরং ধার্মিক সন্তান জন্মদান, নেক পরিবার প্রতিষ্ঠা, এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য।

হুজূর (আ.) বললেন: দুনিয়াদাররা দুনিয়াবি বিষয় চায়। কেউ সৌন্দর্য খোঁজে; কেউ সৌন্দর্যকে গুরুত্ব না দিয়ে অন্য কিছু চায়। কিন্তু খুব কম সংখ্যক মানুষই ধর্মকে অগ্রাধিকার দেয়। অথচ একজন মুমিনকে ধর্মকে সর্বোচ্চ স্থান দিতে বলা হয়েছে। সামঞ্জস্য (কাফা'আ) সম্পর্কেও ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে–বিবিধ দিক আছে–তবুও সামঞ্জস্যের মধ্যেও তাকওয়া ও ধর্মকে প্রথমে রাখতে হবে।

হুজূর (আ.) বললেন: তাই মেয়ে ও ছেলেদের উভয়কেই নিজেদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অবস্থার দিকে মনোযোগী হতে হবে। আল্লাহ আমাদের থেকে কী চান, কুরআনের

মহানবী (সা.)-এর বাণী

সদকা কখনও কারো সম্পদ হ্রাস করে নি আর আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা দানের কারণে বান্দার সম্মান বৃদ্ধিই করে থাকেন।

(সহী মুসলিম, কিতাবুর বির ওয়াসসিলাহ ওয়াল আদাব)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and family, Barisha (Kolkata)

শিক্ষাসমূহ আমাদের থেকে কী দাবি করে, এসব বিষয়ে নিয়মিত চিন্তাভাবনা করতে হবে। এটাই ধর্ম। এবং যদি কেউ এতে দৃঢ় থাকে, তবে আল্লাহর অনুগ্রহে বিবাহ দীর্ঘস্থায়ী হয়-এবং ভবিষ্যত প্রজন্ম তাকওয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্বব্যাপী-এমনকি আমাদের জামাতের মধ্যেও-বিবাহ ভাঙার ও দ্বন্দ্বের ক্রমবর্ধমান কারণ হলো বহু মানুষ এখন তাদের অনুসরণ করছে যারা ধর্ম থেকে দূরে সরে গেছে। স্বাধীনতার নামে মানুষ মনে করে, যা ইচ্ছে তাই করার অধিকার তাদের আছে। অথচ আল্লাহ নির্দিষ্ট সীমা স্থির করেছেন। পবিত্র কুরআন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান; ঘরোয়া জীবন থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত সবকিছু স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। যদি এ শিক্ষাগুলো পালন করা হয়, মানবজীবন এমন শান্ত, প্রেমময় ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে যা কল্পনাও করা যায় না।

হুজূর (আ.) বললেন: কিন্তু তাকওয়া থেকে দূরে সরে গেলে মানুষ অন্যদের অনুকরণ করতে শুরু করে। আর যদি তাকওয়া অন্তরে থাকে, তবে কখনোই মনে হবে না যে দুনিয়াবি স্বাধীনতা উত্তম এবং তা গ্রহণযোগ্য। স্বাধীনতার সীমা আছে; সীমাহীন স্বাধীনতা ইসলাম অনুমতি দেয় না। অতএব আমরা যদি মুসলমান-আহমদী মুসলমান-হিসেবে থাকতে চাই, তাহলে আমাদের দেখতে হবে আমাদের সীমা কোথায় শেষ হয়। যদি আমাদের ছেলে-মেয়েরা তাকওয়া গ্রহণ করে এবং বিবাহে তাকওয়াকে প্রাধান্য দেয়, তবে কেবল ব্যক্তিগত সংঘাতই কমবে না; বরং পরিবার ও ব্যক্তি উভয়ের মধ্যেই গভীর পরিবর্তন আসবে এবং জামাতে এক ধার্মিক বিপ্লব সৃষ্টি হবে। আল্লাহ বারবার বলেছেন যে দুনিয়াবি আকাঙ্ক্ষা কখনো অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত নয়; বরং আখিরাতের চিন্তা থাকা উচিত। আয়াতে বলা হয়েছে: "প্রত্যেক প্রাণ লক্ষ্য করুক সে আগামী দিনের জন্য কী পাঠাচ্ছে।" "আগামী দিন"দুই অর্থ বহন করে: বিবাহের প্রসঙ্গে, এর অর্থ হলো-তোমরা কতটা তাকওয়া ভিত্তিক নেক দাম্পত্যের মাধ্যমে ভবিষ্যত প্রজন্ম গড়ে তুলছ? তোমরা কি এমন সন্তান লালন করছ যারা ধর্মের উত্তরাধিকারী হবে, কেবল দুনিয়াবি নয়? এমন সন্তান লালন কর যারা মৃত্যুর পর বাবা-মায়ের জন্য দোয়া করবে। এমন মা হও, যাদের পায়ের নিচে জান্নাত; যাদের সন্তান নেককার হয়। এবং নিজেদের এমনভাবে গড়ে তোল যে আল্লাহ পরকালে পুরস্কার দান করেন। কুরআনের শিক্ষা সামনে রাখো এবং তা পালন করার চেষ্টা করো।

হুজূর (আ.) বললেন: আজ পাঠ করা প্রথম আয়াতেই তাকওয়া দু'বার এসেছে। আমি বলেছি, তাকওয়া থাকলে সমস্যা এখন যেমন বেড়ে যায়, তেমন বৃদ্ধি পায় না। ছেলেরা ক্ষতিকর প্রভাব থেকে নিজেদের বাঁচানোর চেষ্টা করবে। যখন তারা নেককার স্ত্রী খোঁজে, তখন ছেলেদের নিজেদেরও নেককার হওয়ার দিকে ঝুঁকতে হবে। অনৈতিক জীবনযাপন করে নেক স্ত্রী আশা করা সম্ভব নয়। নেক স্ত্রী চাইলে নিজেকেও নেক হতে হবে। একইভাবে, যখন মেয়েরা দেখবে যে তাদের সম্পর্ক নেকির ভিত্তিতে গড়ে উঠছে, তখন তারাও দুনিয়াবি আকাঙ্ক্ষা ও অপ্রয়োজনীয় ফ্যাশনের চেয়ে তাকওয়াকে অগ্রাধিকার দেবে। কিছুটা ফ্যাশন বৈধ; সুন্দর পোশাক বৈধ; সৌন্দর্যচর্চা বৈধ। কিন্তু বাড়াবাড়ি হলে তাকওয়া কমে যায়। তাই এটি একটি পারস্পরিক প্রচেষ্টা। মেয়েদেরও তাকওয়ার দিকে এগোতে হবে এবং ছেলেদেরও। বাবা-মায়েরও দায়িত্ব আছে সন্তানদের এভাবে গড়ে তোলার। কেবল সভা-সম্মেলনে বলা যথেষ্ট নয় যে আমরা ধর্মকে দুনিয়ার ওপর অগ্রাধিকার দেব; বরঞ্চ বাস্তব জীবনেও তা ফুটে উঠতে হবে।

হুজূর (আ.) বললেন: এ হতে পারে না যে কেউ আল্লাহতে ঈমান রাখে, অথচ তাঁর নির্দেশ অমান্য করে। যদি কেউ সত্যই সর্বশক্তিমান আল্লাহতে বিশ্বাস করে, তবে তাকে অবশ্যই নিজের আগামী দিনের ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। আল্লাহ তোমাদের তোমাদের 'আগামী দিনের' প্রতি লক্ষ্য রাখতে বলেছেন; নচেত আমল নিষ্ফল। মৃত্যুর পর কেবল আল্লাহর উদ্দেশে করা কাজই কাজে আসবে। প্রত্যেকে দেখুক তার প্রতিটি কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, না নিছক দুনিয়াবি প্রদর্শনের জন্য।

হুজূর (আ.) বললেন: কিছুদিন আগে আমি এক দীর্ঘ হাদিস উল্লেখ করেছি। সেখানে বহু আমল ফেরেশতারা বা আল্লাহই প্রত্যাখ্যান করেছেন-কারণ সেগুলোতে নিষ্ঠা ছিল না। অতএব, প্রতিটি কাজে খাঁটি নিষ্ঠা থাকা জরুরি, এবং আন্তরিক দোয়া করা জরুরি, কারণ কেবল আল্লাহর অনুগ্রহই আমাদের রক্ষা করতে পারে। আল্লাহ বলেন: তোমরা মানুষকে ধোঁকা দিতে পারো; বিবাদে তোমরা তোমাদের পক্ষে রায় আদায় করতে পারো; নারীরা ভাষার দক্ষতা ব্যবহার করে অধিকারহীন দাবিও আদায় করতে পারে; পুরুষেরাও তাই করতে পারে। কিন্তু তাকওয়া থাকলে-অত্যন্ত বিরল কিছু ঘটনা বাদে-এইসব জুলুম কখনও ঘটবে না। অন্যায় দাবিগুলো তাকওয়া-পরায়ণতা থাকলে অসম্ভব; কেবল ভুল বোঝাবুঝি জন্মাতে পারে।

হুজূর (আ.) বললেন: স্মরণ রাখতে হবে যে আমরা এই যুগের ইমামকে গ্রহণ করেছি-যিনি আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পূর্ণ আনুগত্যে নবুওতের মর্যাদা প্রাপ্ত, এবং মানবতা সংস্কার, আল্লাহ-মানব সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা, ও তাকওয়ার পথ প্রদর্শনের জন্য পাঠানো হয়েছে। যদি আমরা আমাদের দায়িত্ব না বুঝি, এবং পরিবর্তে দুনিয়ার বৈভবকে সবকিছু ভাবি, তবে আহমদী হওয়ার কোনো সুফল নেই। আহমদিয়্যাতের দাবি করা, নির্যাতন সহ্য করা, গালি শোনা-তারপরও আল্লাহর দৃষ্টিতে তাকওয়া-শূন্য থাকা-এর কোনো উপকার নেই। তোমাদের অনেকেই পাকিস্তান থেকে হিজরত করেছ; কারণ সেখানের পরিবেশ স্বাধীনতার অনুকূল নয়। আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহে তোমাদের এমন দেশে নিয়ে এসেছেন যেখানে শান্তিতে বসবাস করতে পারো। সুতরাং প্রকৃত কৃতজ্ঞতা হলো তাকওয়ায় অগ্রগতি করা, ধর্মকে দুনিয়ার ওপরে স্থান দেওয়া, এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করা-দুনিয়াবি ঝলমলে জীবনে ডুবে যাওয়া নয়। গতকাল আমি প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) আমাদের থেকে কী চান সে সম্পর্কে বলেছি, এবং তিনি কত বেদনার সাথে আমাদের আত্মিক রূপান্তরের জন্য উপদেশ দিয়েছেন। এক স্থানে তিনি বলেন:

"আমার জামাতের লোকেরা যেন কেবল নামমাত্র আমার অনুসারী হয়ে আমাকে লজ্জিত না করে।"

এই বাক্যে গভীর বেদনাবোধ আছে। আমাদের নিজেদের অবস্থা পর্যালোচনা করতে হবে। যদিও আমি নারীদের উদ্দেশ্যে বলছি, এই নির্দেশ পুরুষদের জন্যও সমান প্রযোজ্য। এবং এখন এমটিএর মাধ্যমে সারা বিশ্বের মানুষ এই কথা শুনছে। কিছু পুরুষ মনে করে, যখন নারীদেরকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, তখন তারা নিশ্চয় নেক এবং কেবল তাদের স্ত্রীই দোষী। এটিও অহংকার-এবং অহংকার তাকওয়ার বিপরীত। এটি প্রমাণ করে তাদের নিজেদেরই তাকওয়া নেই। প্রত্যেকের বিনয়ী হওয়া উচিত। তেমনি নারীদেরও উচিত নয় সব দোষ পুরুষদের ওপর চাপানো। যেমন বলা হয়েছে, যদি উভয় পক্ষের মধ্যে তাকওয়া থাকে তবে দোষারোপ দূর হবে, এবং দাম্পত্য জীবন ভালোবাসা ও স্নেহে পরিপূর্ণ হবে। একটি শান্তিপূর্ণ পরিবারের এটাই লক্ষণ। কখনও দুই-তিনটি সন্তানের পরও বিবাদ এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে তালাক দিতে হয়; কখনও পরিস্থিতির কারণে নারীদের খোলা চাইতে হয়। আমি বলছি না যে প্রতিটি খোলা অন্যায়-কিছু পুরুষ এমন অন্যায় করে যে খোলা যুক্তিযুক্ত। কিন্তু সন্তানদের আকাঙ্ক্ষার খাতিরে নারী-পুরুষ উভয়েরই কিছু ত্যাগ স্বীকার করা উচিত। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ক্ষুদ্র মতবিরোধ দূর করতে হবে। একইভাবে, অনেকে জীবনের একেবারে শুরুতেই সম্পর্ক ভেঙে দেয়, বলে "বোঝাপড়া নেই।" এটি একটি ভুল প্রবণতা-ধর্মহীন সমাজের প্রভাব। কিন্তু একজন আহমদী মুসলিম-যার ঈমান অনুযায়ী সে এই যুগে সবচেয়ে ধর্মানুরাগী-তার জন্য এসব পথ অনুসরণ করা উচিত নয়।

হুজূর (আ.) বললেন: বিবাহের এই উদাহরণ কেবল একটি দিক। তাকওয়া এখানে শেষ নয়। কুরআনে বহু নির্দেশ আছে, জীবনের প্রতিটি ধাপ, প্রতিটি দিক নিয়ে। সেগুলো সামনে রাখতে হবে। কুরআনের নির্দেশ পালন করার মাধ্যমেই তাকওয়ার পথে চলা যায়। আল্লাহর কোনো আদেশ তুচ্ছ নয়। কুরআনে বর্ণিত প্রতিটি নির্দেশ মুমিন পুরুষ ও নারীর পালন করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ-সালাত। ইবাদত একটি স্পষ্ট নির্দেশ। যথাযথভাবে তা পালন করতে হবে; অবহেলা চলবে না।

হুজূর (আ.) বললেন: একজন নারী তার ঘরের রক্ষক। হাদিসে এসেছে নারী তার পরিবারের রক্ষক। যদি সে নিজে সালাত, কুরআন তিলাওয়াত ও দ্বীন শেখার প্রতি যত্নবান হয়, তবে সন্তানরাও এসব বিষয়ে মনোযোগী হবে। কিছু নারী অভিযোগ করে তাদের স্বামী ধর্মীয় কর্তব্যে মনোযোগ দেয় না। যদি তা সত্য হয়, তবে তাদের স্মরণ করিয়ে দাও; এটিও তোমাদের দায়িত্ব। যথাযথ সময়ে, যথাযথ ভঙ্গিতে তাদের বলো যে তাদের অবহেলা কেবল নিজেদের জন্য ক্ষতিকর নয়, বরং পরবর্তী প্রজন্মকেও বিপথে নিয়ে যায়।

হুজূর (আ.) বললেন: সুতরাং নারীদের ওপর এক বড় দায়িত্ব ন্যস্ত যে তারা নিজেদের জন্যই নয়, তাদের বংশধরদের জন্যও ধর্মকে দুনিয়ার ওপরে স্থান দেবে। তারা আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ককে দৃঢ়

যুগ ইমামের বাণী

খোদা তোমাদের সঙ্গে থাকবেন, যদি তোমরা মুত্তাকি হও এবং তাকওয়ার সূক্ষ্ম পথসমূহে বিচরণ কর।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২০০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk.Fayjal Sb. and Family, Jaynagar, Bankura, WB

করবে এবং ইবাদতের মান উচ্চ করবে।

হুজূর (আ.) বললেন: নারীদের জন্য যে নির্দেশসমূহ আছে, তার মধ্যে পর্দার নির্দেশ অন্যতম। এটি কেবল চৌদ্দশ বছর আগের জন্য ছিল না; বরং কুরআনের এক জীবন্ত নির্দেশ। আজ যেমন তা প্রযোজ্য, তেমনই তখনও ছিল। পর্দার উদ্দেশ্য হলো শালীনতা রক্ষা করা, অপ্রয়োজনীয় নারী-পুরুষ মেলামেশা রোধ করা, অশালীন চিন্তা প্রতিরোধ করা, এবং তাকওয়ার পথে চলার সহায়তা করা। প্রত্যেক নারীর দেখা উচিত তার শালীনতার মান আল্লাহর চাহিদা অনুযায়ী কি না। সে কি অপ্রয়োজনীয়ভাবে পরপুরুষের সাথে যোগাযোগ করছে কি না।

হুজূর (আ.) বললেন: তারপর আছে অশালীন চিন্তা। আজকাল চলচ্চিত্র যুবকদের মনে অশ্লীলতা সৃষ্টিতে বড় ভূমিকা রাখছে-যদিও অভিযোগ আছে কিছু প্রাপ্তবয়স্ক, বিশেষত পুরুষদের সম্পর্কেও। ঘর ভেঙে যাচ্ছে কারণ মানুষ টিভি বা ইন্টারনেটে অশালীন চলচ্চিত্র দেখে সময় নষ্ট করছে। স্বাধীনতার নামে অশ্লীলতা সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে। এসব চলচ্চিত্র কখনোই পবিত্র চিন্তা সৃষ্টি করতে পারে না। যাঁরা এসব বানায় তারাও জানে এগুলো ক্ষতিকর। তাই সতর্কীকরণ লেখা থাকে: "শিশুদের জন্য নিষিদ্ধ,"বা প্যারেন্টাল লক ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়। তাতে প্রমাণ তারা নিজেরাই জানে এগুলো ক্ষতিকর, তবুও স্বাধীনতার নামে অশ্লীলতা ছড়ায়। এমন সমাজে যেখানে এ ধরনের ময়লা স্বাভাবিক হয়ে গেছে, সেখানে তাকওয়া কোথায় থাকবে? তাই এমন পরিবেশে বসবাসকারী আহমদী নারী, মেয়ে, পুরুষ ও যুবকদের খুব সতর্কভাবে চলতে হবে।

হুজূর (আ.) বললেন: তারপর আছে ফ্যাশনের বিষয়। প্রতিটি আহমদী নারী ও মেয়ে মনে রাখবে-যেমন পূর্বে বলেছি-যথোপযুক্ত সীমার মধ্যে ফ্যাশন বৈধ, কিন্তু অনেকেই এমন টাইট জিন্স, ব্লাউজ বা টি-শার্ট পরে যা নারীত্বের মর্যাদার বিরুদ্ধে। এ ধরনের পোশাক ঘরের এমন পুরুষদের সামনে পরাও উচিত নয় যাদের সাথে পর্দা নেই-পরপুরুষ তো দূরের কথা। মেয়েরা স্মরণ রাখবে পোশাক ও পরিবেশ চিন্তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে-ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয়ভাবেই। জিন্স পরতে কোনো দোষ নেই; আমি কখনো নিষিদ্ধ করিনি। তবে তা পরলে অন্তত হাঁটু পর্যন্ত লম্বা শার্ট থাকতে হবে। কিছুদিন আগে এখানকার কেউ আমাকে লিখেছিলেন যে কিছু নারী-যারা সাধারণত বাহিরে স্কার্ফও পরে না-এখন বড় হিজাব বা বোরকা সেলাই করেছে, কারণ আমি আসছি। কেবল আমাকে দেখানোর উদ্দেশ্যে হলে এর কোনো মূল্য নেই। আল্লাহ বলেন, তাঁর দৃষ্টি তোমাদের ওপর। "নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।" তিনি অন্তরের খবর জানেন। তবে যদি উদ্দেশ্য হয় যে এই কয়েক দিনের হিজাব তাদের মধ্যে শালীনতার পুনরুজ্জীবন ঘটাবে এবং তা স্থায়ী অভ্যাসে পরিণত হবে, তবে তা প্রশংসনীয়। এতে দোষ নেই। তবে মনে রাখতে হবে প্রতিটি কাজ কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হওয়া উচিত-কারো দেখানোর জন্য নয়।

হুজূর (আ.) বললেন: যদি কোনো আহমদী নারী বা মেয়ে তাকওয়ার পথে চলতে চায়, তবে তাকে তার পোশাক ও শালীনতার দিকে মনোযোগী হতে হবে; সে যেন লজ্জাশীল হয়। নচেত পরিবেশ তাকে নৈতিক অধঃপতনের দিকে নিয়ে যেতে পারে। সময় আমাকে সব কুরআনিক নির্দেশ বিশদভাবে তুলে ধরার সুযোগ দিচ্ছে না। তবে প্রত্যেক আহমদীর প্রত্যাশা যে তারা তাকওয়ায় অগ্রগতি করবে, কুরআনের নির্দেশসমূহ খুঁজে বের করবে, আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ অনুসন্ধান করবে এবং আন্তরিক চেষ্টা করবে। আজ করার মতো কাজ হলো-বিশ্বের মানুষকে পথ দেখানো ও তাদের সংস্কার করা-এটাই আহমদী জামাতের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব। কারণ আহমদীরা আজ দাবি করে যে তারা আল্লাহর সঙ্গে জীবন্ত সম্পর্ক রাখে।

হুজূর (আ.) বললেন: আমি কয়েকটি উদাহরণ দিয়েছি মানে এই নয় যে সংখ্যাগরিষ্ঠরা অবহেলাকারী-আল্লাহর ফজলে সংখ্যাগরিষ্ঠই ভালো। কিন্তু একটি ছোট অংশ যদি ধর্মানুযায়ী না চলে, তবে তা অন্যদেরও ক্ষতি করতে পারে। উদ্বেগ তখন বাড়ে যখন সেই ছোট অংশটি বৃদ্ধি পেতে শুরু করে।

হুজূর (আ.) বললেন: তাই আত্মসমালোচনা অত্যন্ত জরুরি। আমরা কতটুকু ধর্মকে দুনিয়ার ওপরে স্থান দিচ্ছি? যে আহমদী তাকওয়ার পথে চলতে চায় এবং আল্লাহর সুরক্ষা কামনা করে, তাকে কুরআনের শিক্ষাসমূহ অধ্যয়ন ও পালন করতে হবে-এবং প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর ব্যাখ্যা অনুসারে চলতে হবে। তিনি বলেছেন, তাকওয়া পরায়ণদের জন্য বিপুল পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি আছে; এবং তাকওয়া পরায়ণদের জন্য এর চেয়ে বড় সম্মান আর কী যে আল্লাহ নিজে তাদের অভিভাবক হয়ে যান?

হুজূর (আ.) বললেন: অতএব যদি আমরা আল্লাহকে অভিভাবক হিসেবে পেতে চাই, তবে আমাদের তাকওয়ার পথে চলতে হবে এবং ধর্মকে দুনিয়ার ওপর অগ্রাধিকার দিতে হবে। আহমদীয়া জামাতে বহু মানুষ আল্লাহর সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। আল্লাহ তাদের দোয়া কবুল করে, প্রয়োজন পূরণ করে, ও বরকত প্রদান করে।

হুজূর (আ.) বললেন: প্রত্যেক আহমদী নারী-পুরুষকে মনে রাখতে হবে যে প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) তাঁর আগমনের লক্ষ্য হিসেবে মানুষের আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেছেন। অতএব প্রত্যেক আহমদীর উচিত আল্লাহর সঙ্গে দৃঢ় সংযোগ স্থাপন করা, এবং তার সন্তানদেরও আল্লাহর সঙ্গে যুক্ত করার প্রচেষ্টা করা। যে সমাজে আমরা বাস করি, সেটিকেও সংস্কার করতে হবে; এখানে একটি আত্মিক বিপ্লব আনতে হবে। আহমদীয়া জামাত কেবল পাকিস্তানি বা কিছু ফিজিয়ান আহমদীদের নিয়ে গঠিত নয়; আমাদের উদ্দেশ্য এর চেয়ে বহু বৃহৎ। আমাদের ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা এই জাতির নিকট পৌঁছাতে হবে, যাতে তারা প্রকৃত ইসলামে প্রবেশ করতে পারে। এজন্য প্রচেষ্টা করতে হবে-তাদের পথ অনুসরণ করে নয়, বরং নিজেদের অবস্থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির সঙ্গে সমন্বয় করে। মনে রাখতে হবে-আহমদীয়া জামাত অবশ্যই অগ্রসর হবে। এটি আল্লাহর প্রতিশ্রুতি। যদি আমরা এই প্রতিশ্রুত অগ্রগতির অংশ হতে চাই, তবে প্রতিটি আহমদী-নারী, পুরুষ, তরুণ, বৃদ্ধ-নিজেকে পবিত্র রূপে পরিবর্তন করতে হবে। নচেত প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-কে প্রতিশ্রুত হয়েছিল যে নতুন জাতিসমূহ প্রস্তুত হয়েছে, যারা শিগগিরই এই জামাতে প্রবেশ করবে এবং আল্লাহর প্রিয়পাত্র হবে। তোমাদের অনেকেই এমন পরিবার থেকে এসেছ, যাদের পূর্বপুরুষেরা আহমদিয়্যাত গ্রহণ করেছিলেন; কিন্তু যদি তোমরা নিজেদের আমল ও চরিত্রকে আল্লাহর ইচ্ছার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না করো, তবে অন্যরা তোমাদের থেকে এগিয়ে যাবে।

হুজূর (আ.) বললেন: এই যুগে আল্লাহ নিজেই মানুষকে পথ প্রদর্শন করেন, তাদের জামাতে অন্তর্ভুক্ত করেন, এবং প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর সত্যতা তাদের নিকট প্রকাশ করেন। আমি কয়েকটি উদাহরণ উপস্থাপন করব যে কিভাবে আল্লাহ নারীদের ও মেয়েদের আহমদিয়্যাতের দিকে পরিচালিত করছেন। এই জামাত কোনো সাধারণ সম্প্রদায় নয়; এটি আল্লাহ প্রতিষ্ঠিত। এটি অবশ্যই অগ্রসর হবে, এবং এর অগ্রগতি তখনই বরকতময় হবে যখন প্রতিটি সদস্য তাকওয়ায় অগ্রগামী হবে। আল্লাহ প্রত্যেক পবিত্র-স্বভাবসম্পন্ন হৃদয়কে পথ দেখান।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বলেন:

টিউনিসিয়ার একজন মহিলার নাম রাজিয়া সাহিবা। তিনি বর্ণনা করেন:

"আমি দীর্ঘ সময় সঁভর ধারা অনুসরণ করেছি। আমার আগে থেকেই ধর্মের প্রতি অনুরাগ ছিল, এবং কখনো জাগতিক প্রলোভনে আকৃষ্ট হইনি। স্বভাবতই আমি নীতিবান ছিলাম। বহু বছর সঁভর প্রথার সাথে সংযুক্ত ছিলাম। পরে হঠাৎ একদিন আপনার চ্যানেলের সন্ধান পেলাম। আমি যাঁদেরকে বিশ্বস্ত মনে করতাম, তাঁদের কাছে আপনার সম্বন্ধে জানতে চাইলে তাঁরা জামাতকে 'কাফের' বলে অভিহিত করলেন। কিন্তু পথনির্দেশের জন্য আমি যে চ্যানেলটি পেলাম সেটিই ছিল এমটিএ।"

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বলেন: "বহিরাগতের লোকেরা পথনির্দেশ লাভের জন্য আমাদের চ্যানেল খোঁজে; আর আমাদের মধ্যে কিছু মানুষ অশালীন ও অনৈতিক চ্যানেল দেখে সময় নষ্ট করে। এমন ব্যক্তিদের দুর্ভাগ্যই বা কত বড়!চ)

তিনি আরও বলেন: "একদিন আমার অল্পবয়সী ছেলে একটি স্বপ্ন দেখল। স্বপ্নে দেখল-আমরা একটি গাড়িতে বসে আছি, যা চালাচ্ছেন মুস্তফা সাবিত সাহিব। আমি সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেলাম যে আমি সঠিক পথে আছি। অতঃপর আমি আহমদীয়া মুসলিম জামাতে যোগদান করি।"

এরপর মিসরের আরেক মহিলার বিবরণ রয়েছে। তিনি বলেন:

যুগ খলীফার বাণী

প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে। এবং নিশ্চয় কিয়ামতের দিনই কেবল তোমাদিগকে তোমাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হইবে। (আলে ইমরান: ১৮৬)

দোয়াপ্রার্থী: Humayun Kabir Molla, Nalhati, Birbhum

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনি, যিনি পরম রিয্‌কদাতা, শক্তির অধিকারী, সুদৃঢ়। (আয যারিয়াত: ৫৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdur Rahaman Sb. Berhampur, Murshidabad

"আমার বাইআতের পরিস্থিতি হলো এ রকম। ২০১১ সালে একদিন বিভিন্ন টিভি চ্যানেল পরিবর্তন করতে করতে হঠাৎ এমটিএ-তে পৌঁছালাম, যেখানে মুস্তফা সাবিত সাহিবের অনুষ্ঠান 'আজউবাহ আনিল ইমান' সম্প্রচারিত হচ্ছিল। এরপর থেকে এমটিএ দেখা অব্যাহত রাখলাম এবং 'আল-হিওয়ারুল মুবারাশির' অনুষ্ঠানটিও পছন্দ হতে লাগল- যেখানে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের সঙ্গে আলোচনা করা হতো। অন্যদের মতো আমিও ঈসা (আ.)-এর অবতরণের অপেক্ষায় ছিলাম। এ বিষয়ে আহমদীদের ব্যাখ্যাগুলো অত্যন্ত যুক্তিসংগত মনে হলো, তবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পরে কোনো নবী আসতে পারেন-এ ধারণাটি প্রথমে আমার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছিল না। একদিন এমটিএ-তে শুনলাম যে আল্লাহ তা'আলা এখনো তাঁর বান্দাদের সঙ্গে কথা বলেন। এই আলোচনা শুনে আমার বহু পুরোনো একটি স্বপ্ন মনে পড়ে গেল।

"২০০৩ সালে রমজান মাসে একদিন আমি নামাজ পড়তে মসজিদে যাই। কিন্তু সেখানে মহিলাদের ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে সিদ্ধান্ত নিই যে ভবিষ্যতে ঘরেই নামাজ আদায় করব।"

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বলেন: "এখানে আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই যে আমাদের কিছু নতুন আহমদী-বরং বহু বছর ধরেও কেউ কেউ- অভিযোগ করেন যে যখন তারা মসজিদে আসেন, তখন পাকিস্তান থেকে আসা বড় অংশটি মূলত উর্দুতে কথা বলেন। অথচ আজকের তরুণীরা ইংরেজিও ভালো বোঝেন। তাই উপস্থিত ব্যক্তির ভাষাতেই কথা বলা উচিত। বিশেষত, যদি কোনো অ-আহমদী আসে, তবে অবশ্যই তার ভাষাতেই কথা বলার চেষ্টা করা উচিত।")

তিনি আরও বলেন:

"নামাজ ও দোয়ার পর আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নে দেখলাম- আকাশে একটি উজ্জ্বল জানালা খুলেছে; সাদা রঙের এবং ডিম্বাকৃতি। একটি ঘোষণাকারী বলছে, 'আমি তোমার প্রভু।' আমি সিজদায় পড়ে তিনবার বললাম: লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাজ্জালিমীন। জেগে উঠে অত্যন্ত আনন্দিত ও বিস্মিত হলাম। আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ অনুভব করে নিশ্চিত হলাম যে তিনি সত্যিই তাঁর বান্দাদের অতি নিকটে এবং প্রার্থনাকারীর দোয়া তিনি অবশ্যই শোনেন ও কবুল করেন।

"এই স্বপ্নের পরদিন আবার স্বপ্ন দেখলাম-এক ব্যক্তি আকাশ থেকে নেমে আসছেন, যেন উড়ে আসছেন। তাঁর চুল ও দাড়ি কালো। তাঁর মাথা থেকে ক্ষেপণাস্ত্রের মতো আলো নির্গত হয়ে আকাশ আলোকিত করছে। তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি বললেন, 'আমি মসীহ।' আমি ভাবলাম তিনি নাসিরী ঈসা (আ.), এবং এটি কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ের নিদর্শন। কিন্তু পরে মনে হলো-ঈসা (আ.) আমার কাছে কেন আসবেন? আমি বিভিন্ন স্বপ্ন ব্যাখ্যার বই দেখলাম, কিন্তু আল্লাহ মানুষকে কথা শুনিয়ে থাকেন-এ সম্পর্কে কোনো ব্যাখ্যা পেলাম না। অন্যদের জিজ্ঞেস করলে তারা বলল: 'আল্লাহ কারও সাথে কথা বলেন না; এমন বিশ্বাস ভুল।'

এ কারণেই আজকের মুসলমানরা যখন আল্লাহর এই 'সিফাতুল কালাম' অস্বীকার করেছে, তখন তারা কীভাবে দীনকে দুনিয়ার ওপর প্রাধান্য দেবে?

"তবে আমি জানলাম-স্বপ্নে মসীহকে দেখা মানে স্বপ্নদ্রষ্টাকে আল্লাহ হিকমত ও নেক সন্তান দেবেন। পরে এমটিএ দেখার মাধ্যমে বুঝলাম-আমি যে ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখেছি তিনি ছিলেন প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)। এর ফলেই আল্লাহ আমাকে হিদায়াত দান করেছেন এবং আমি সত্য গ্রহণ করেছি।"

এরপর আলজেরিয়ার বাশকিত সাহিবার বিবরণ। তিনি বলেন:

"বাইআতের পূর্বে আমার মনে একটি প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছিল: ইসলাম আগমনের পূর্বে আল্লাহ বহু নবী ও রাসূল পাঠিয়েছিলেন; পরে পাঠালেন হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে। অথচ আজ মানবজাতির যে অবস্থা- ফ্যাসাদ, নীতিহীনতা ও প্রকৃত ইসলাম থেকে বিচ্যুতি-এর তুলনা ইতিহাসে নেই। আমার মনে তীব্র ইচ্ছা জাগল- আল্লাহ যেন উম্মতের সংস্কারের জন্য কাউকে পাঠান।"

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বলেন: "দেখুন- আমাদের মধ্যে কেউ কেউ কোন দিকে যাচ্ছে, আর বহিরাগত কিছু মানুষ দীন নিয়ে কত উদ্বিগ্ন, এবং আল্লাহ তাঁদেরই পথ দেখাচ্ছেন।")

তিনি বলেন:

"একদিন আমার ভাই আব্দুল আলী বাশকিত আমাকে ঈসা (আ.)-এর পুনরাগমন, জিন ও কুরআনের 'নামলাহ' সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা দিলেন। তাঁর ব্যাখ্যাগুলো আমার কাছে অত্যন্ত অর্থবহ ও আকর্ষণীয় মনে হলো। পরে তাঁর টেবিলে কিছু ফোল্ডার দেখলাম। সেগুলো পড়ে মনে হলো যেন আমি এক সুন্দর জগতে-বরং যেন এক জান্নাতে- প্রবেশ করেছি। যত পড়ছি, তত মনে হচ্ছে আমার অন্তর পরিশুদ্ধ হচ্ছে। দিনের কাজেও মন সেসব বইয়ের কথা ভাবত। তারপর ভাই আমাকে ইমাম মাহদী সম্পর্কে জানালেন-যিনি প্রতিশ্রুত মসীহ এবং আল্লাহর প্রেরিত।

"অন্যান্য মুসলিম গোষ্ঠী যারা সহিংসতা ও সংঘাতের শিক্ষা দেয়- তাদের কোনো পথই আমাকে সন্তুষ্ট করেনি। আলেমদের চ্যানেলগুলোর প্রতিও আকর্ষণ ছিল না। কিন্তু প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর মুখমণ্ডল এতই নূরানী যে প্রথম দেখাতেই মানুষ মোহিত হয়ে যায়। তিনি এতটাই বিশিষ্ট-যেন অন্ধকারের বিপরীতে আলো। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি প্রেমে, প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর সমতুল্য কাউকে আমি পাইনি।

"অতঃপর আমি ইস্তিখারা করলাম। স্বপ্নে অনুভব করলাম-আমার অন্তর থেকে এক জোরাল কণ্ঠ বলছে: 'এ ব্যক্তিই মাহদী-এই তিনিই ইমাম মাহদী।' এই আওয়াজে আমি রাতভর ঘুমাতে পারিনি। মনে মনে বলতাম, 'আমাকে অবশ্যই বাইআত করতে হবে।' এক শান্তি আমার অন্তরে ছড়িয়ে পড়ল, কিন্তু একই সঙ্গে আশঙ্কা হলো-বাইআত করার আগে যদি মৃত্যু এসে যায়! আল্লাহর অনুগ্রহে আমি বাইআতের তাওফিক পেলাম। এখন আমি প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করতে চাই-এবং সত্যিই সে অধ্যয়ন অব্যাহত রেখেছি।"

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বলেন:

"সুতরাং পবিত্র কুরআনের বিধিবিধান গভীরভাবে বোঝার জন্য প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর গ্রন্থ অধ্যয়ন অত্যন্ত জরুরি। কেউ যদি উর্দু না জানেন, তবে ইংরেজিতে যে সাহিত্য রয়েছে তা পড়বেন। আর যারা উর্দু জানেন, তারা উর্দুতেই পড়বেন। এভাবেই আত্মোন্নয়ন সম্ভব; কারণ কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর মাধ্যমেই পাওয়া যায়।"

এরপর ইয়েমেনের এক নবাগত আহমদী মহিলা বলেন:

"আমার পিতা ছিলেন একজন আলেম। তিনি আমাকে বলতেন- ইমাম মাহদীর প্রকাশের সব নিদর্শন পূর্ণ হয়েছে। তিনি বলতেন, 'আমার মৃত্যুর পর যদি ইমাম মাহদী প্রকাশিত হন, তবে তুমি অবশ্যই তাঁর বাইআত করবে।' আমি জিজ্ঞেস করতাম- 'তিনি কীভাবে প্রকাশিত হবেন?' পিতা বলতেন-'তিনি টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রকাশিত হবেন; সারা পৃথিবী তাঁকে দেখবে।' পিতার মৃত্যু পর একদিন চ্যানেল পরিবর্তন করতে করতে আমি এমটিএ পেলাম। এমটিএ-র মাধ্যমে ইমাম মাহদীর আগমনের সংবাদ পেলাম। পিতার কথার বাস্তবতা দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। ইস্তিখারা করলাম; আল্লাহ আমাকে সঠিক পথ দেখালেন; আমিও এবং আমার মাও বাইআত করলাম।"

এরপর তানজানিয়ার এক মহিলার ঘটনা। মানুষ বলে-আফ্রিকার লোকেরা নাকি নিরক্ষর। অথচ শুনুন: এক বয়স্ক অ-আহমদী মহিলা আমাদের মসজিদে জুমার নামাজ পড়তে আসেন। পরে মিশনারির বাসায় যান। তাঁকে যে ঘরে বসানো হয় সেখানে দেয়ালে জামাতের ক্যালেন্ডার টাঙানো ছিল, যাতে প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) ও খলিফাগণের ছবি ছিল। তিনি প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর ছবিতে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলেন, "এ কে?"তাঁকে বলা হলো-এ হলেন প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী, যুগের ইমাম। মহিলা বললেন-"এ তো সেই বুজুর্গ, যাকে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম; তিনি আমাকে তাঁর দিকে আহ্বান করছিলেন।" তিনি সঙ্গে সঙ্গে বাইআত করলেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বলেন:

"সুতরাং শুধু ইউরোপেই নয়, আফ্রিকায়, এশিয়ায় এবং দূর-দূরান্তের অঞ্চলেও আল্লাহ পথনির্দেশ প্রদান করেন-যদি আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করা হয়। যারা এখনো প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-কে গ্রহণ করেনি, তাদেরকেও যখন আল্লাহ পথ দেখান, তখন যারা গ্রহণ করেছে, তাঁদের প্রতি কত অধিক অনুগ্রহে তিনি পথনির্দেশ দেবেন! তবে এর জন্য প্রচেষ্টা থাকা চাই। আমাদের প্রত্যেকের উচিত আল্লাহর আদেশসমূহ পালন করার চেষ্টা করা, তাঁর কথার প্রতি সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা। অযথা বিভিন্ন জাগতিক চ্যানেল দেখে সময় নষ্ট না করে অন্তত দিনের একটি অংশ এমটিএ-র এমন অনুষ্ঠান দেখুন, যা আপনাদের আধ্যাত্মিক উন্নয়নে সহায়ক।

"এই দুনিয়া আমাদের চূড়ান্ত সম্পদ নয়; দুনিয়া আমাদের সবকিছু নয়। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যই যদি প্রধান হয়, তবে হৃদয় প্রকৃত শান্তি পায়-কেবল এ জীবনেই নয়, পরকালের জীবনেও আল্লাহর অনুগ্রহের আঁচলে মানব স্নিগ্ধতা লাভ করে। আল্লাহ করুন-জাগতিক আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তে আমরা সবাই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের তৃষ্ণা বহনকারী হই। আমাদের ঘর-বাড়ি যেন জান্নাতের নমুনা হয়ে ওঠে, এবং পরকালে আমরাও যেন তাঁর বরকতের উত্তরাধিকারী হই।"

বক্তৃতার শেষে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) সমবেত সকলকে দোয়া করান।

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ পঞ্চম (আইদাহুল্লাহু তা'আলা বিনরাহিল আজীয)-এর কর্মীদের উদ্দেশে ভাষণ

তাশাহ্?হুদ, তাআউয এবং সূরা আল-ফাতিহা তিলাওয়াতের পর হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আজীয) বলেন:

"আজ প্রায় সাত বছর পর আপনাদের জামায়াতের বাৎসরিক জলসার সহায়ক কর্মীদের সামনে কিছু কথা বলার সুযোগ পাচ্ছি। আল্লাহ্?র অশেষ অনুগ্রহে প্রতি বছর-বরং বলা উচিত, প্রতিদিনই-জামাআতের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে, এবং আল্লাহ্? তাআলা জামাআতকে ক্রমাগত আরও বেশি নিবেদিতপ্রাণ সেবক প্রদান করে চলেছেন। ওয়াকফে নও কর্মীদের অনেকেই এখন জামাআতের স্থায়ী, পূর্ণকালীন কর্মী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

তবে জলসার প্রশাসনিক সংগঠন এমন যে, এতে বিপুল সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবকের প্রয়োজন হয়; আপনাদের মধ্যে অনেকেই বহু বছর ধরে এ কাজে নিযুক্ত আছেন। আবার কেউ কেউ নতুন। যারা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন, তাদের উচিত নতুন কর্মীদের ভালবাসা ও সদয় আচরণের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া; শিশুদের প্রশিক্ষণ দেওয়া, যুবকদের দিকনির্দেশনা দেওয়া; এবং যারা নতুন-শিশু হোক বা তরুণ, পাকিস্তান থেকেও অনেকেই এসে থাকবে-তাদের উচিত এখানকার কার্যপদ্ধতি শেখার প্রতি মনোযোগী হওয়া, যেমনটি অন্য দেশগুলোতেও করা হয়।

যে কাজই হোক, যত ক্ষুদ্রই হোক, তা কখনোই তুচ্ছ নয়। তার গভীরতা বোঝার চেষ্টা করা উচিত এবং আগের তুলনায় আরও উন্নতভাবে সম্পাদনের চেষ্টা অব্যাহত রাখা উচিত। জলসা সালানার অতিথিদের সর্বোত্তম সেবার জন্য নতুন পদ্ধতি ও উন্নত ব্যবস্থা অনুসন্ধান করা জরুরি।

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ পঞ্চম (আইদাহুল্লাহু তা'আলা বিন?ি?হিল্ আজীয) আরও বলেন: জলসার অতিথিদের অধিকাংশই অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত, এবং তারা সবাই এখানকার অধিবাসী। কিন্তু এই মুহূর্তে তারা আসছেন সেই উদ্দেশ্যে যে, প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ) জলসার যে গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন, তাতে অংশগ্রহণ করবেন। সুতরাং তাদের আদর্শিকভাবে আতিথ্য প্রদান করা প্রতিটি কর্মীর দায়িত্ব।

গাড়ি যখন পার্কিং এলাকায় পৌঁছায়, তখন সৌজন্য প্রদর্শন করুন এবং তাদের সঠিকভাবে পার্ক করতে সহায়তা করুন। যারা নিরাপত্তার দায়িত্বে আছেন, তারা নিশ্চয়ই নিরাপত্তার ওপর দৃষ্টি রাখবেন, কিন্তু আগত অতিথিদের সঙ্গে ভালবাসা ও কোমল আচরণ করবেন। যারা খাবার পরিবেশন করেন, তারা অতিথিরা যতবারই খাবার চাইুক না কেন, তা প্রদান করবেন এবং কখনোই এই ধারণা তৈরি করবেন না যে তারা বহুবার খেয়েছেন বা বারবার নিয়েছেন। কিছু মানুষের একটি পরিবেশনায় যথাযথ তৃপ্তি হয় না; তারা দুই-তিনবারও নিতে পারেন। তাই কাউকে বিব্রত বা লজ্জিত হওয়ার মতো কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি করা উচিত নয়।

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আরও বলেন: শিশুদেরও দায়িত্ব থাকে। আল্লাহর অনুগ্রহে তারা অত্যন্ত সুন্দরভাবে দায়িত্ব পালন করে-পানি পরিবেশনের দায়িত্ব হোক বা অন্য কাজ। আমাদের অ-আহমদী অতিথিরা, যারা জলসায় অংশ নেন-এবং আশা করি এখানে-ও অংশ নেবেন-তারা বিশেষভাবে মুগ্ধ হন এই কারণে যে আহমদী কর্মীরা অত্যন্ত উৎকৃষ্ট চরিত্র প্রদর্শন করেন; কারো কপালে ভাঁজ দেখা যায় না; প্রত্যেকে সেবার জন্য সদা প্রস্তুত। শিশু, তরুণ, নারী ও প্রাপ্তবয়স্ক-সবাই সেবায় যুক্ত, এবং এটি নীরব প্রচারের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং আপনারা যেন কখনো মনে না করেন যে কেবল জলসার দায়িত্ব পালন করে অতিথিদের সুবিধা দিচ্ছেন; বরং আপনার প্রতিটি কাজ ও প্রতিটি দায়িত্বই নীরব তাবলীগের অংশ। একইভাবে কর্মকর্তারাও তাদের উত্তম আচরণের মাধ্যমে অধীনস্তদের, যুবকদের এবং শিশুদের নীরবে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন।

অতএব, সর্বদা মনে রাখা উচিত যে আমাদের জলসাগুলো কেবল নৈতিক ও আত্মিক প্রশিক্ষণের সমাবেশ নয়; বরং তা তাবলীগের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ। এবং কেবল বক্তারা বা আলোচকরা প্রশিক্ষণ ও তাবলীগ করেন না; বরং প্রতিটি কর্মীর আচরণও প্রশিক্ষণ ও প্রচারের একটি অংশ হয়ে দাঁড়ায়। এই কারণেই প্রত্যেকের উচিত এই গুরুত্ব সবসময় স্মরণে রাখা। আল্লাহর অনুগ্রহে আমি লক্ষ্য করেছি যে ব্যবস্থাপনার পরিসর ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তা আরও উন্নতভাবে সম্পাদিত হচ্ছে। আল্লাহ্ আপনাদের সবাইকে সেই দায়িত্বগুলো সর্বোত্তমভাবে পালন করার তাওফিক দিন। এখন দোয়া করি।"

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে প্রেস প্রতিনিধিবৃন্দের সাক্ষাৎকার

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ পঞ্চম (আইদাহুল্লাহু তাআলা বিনাসরিহিল্-আজীয)-এর আগমন-পূর্বে ডেইলি টেলিগ্রাফ (একটি সরকারি পত্রিকা), স্থানীয় পত্রিকা দ্য স্ট্যান্ডার্ড, এবং স্থানীয় সাপ্তাহিক ব্ল্যাকটাউন সান-এর প্রতিনিধিবৃন্দ তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য উপস্থিত ছিলেন।

একজন সাংবাদিক প্রথম প্রশ্নটি উপস্থাপন করলেন: আহমদিদের সাথে অন্যান্য মুসলমানদের কী পার্থক্য, এবং মতবিরোধের মূল কারণগুলো কী?

জবাবে হযরত খলিফাতুল মসীহ্ পঞ্চম (আইদাহুল্লাহু তাআলা বিনাসরিহিল আযীয়) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন- এক সময় এমন আসবে যখন ইসলামের কেবল নামমাত্র থাকবে এবং কুরআনেরও কেবল লিখিত অংশটুকুই অবশিষ্ট থাকবে; মানুষ ইসলাম-এর প্রকৃত শিক্ষা ভুলে যাবে। তাদের মসজিদগুলো জনাকীর্ণ দেখালেও সেগুলো হেদায়েতশূন্য হবে। সেই যুগে আল্লাহ তাআলা মসীহ্ ও মাহদী পাঠাবেন, যিনি ইসলামের বিশুদ্ধ ও প্রকৃত শিক্ষাকে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরবেন এবং তার আসল রূপ উদ্ভাসিত করবেন।

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ পঞ্চম (আইদাহুল্লাহু তাআলা বিন?ি?হিল্-আজীয) আরও বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বিশ্বাস করি-এবং এটিই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস-যে কাদিয়ান-এর হযরত মির্জা গুলাম আহমদ (আ.)-ই আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রেরিত প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী। আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করি যে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ইতিমধ্যে আগমন করেছেন, অথচ অন্যান্য মুসলমান বলেন যে তিনি এখনো আগমন করেননি। তাদের বিশ্বাস, ঈসা (আ.) শারীরিকভাবে আসমান থেকে অবতরণ করবেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পর পুনরায় নবী হিসেবে আগমন করবেন।

আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে বলি যে, আসমান থেকে কেউ অবতরণ করবেন না; বরং যিনি আগমনের প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন, তিনি ঈসা (আ.)-এর প্রতিরূপ রূপে আগমন করবেন-এবং তিনি ইতোমধ্যেই এসে গেছেন।

আমরা বিশ্বাস করি যে হযরত মির্জা গুলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) শরীয়তবিহীন নবী-তিনি নতুন কোনো শরীয়ত আনেননি। অতএব তাঁর আগমন খাতামান-নবিয়্যীন মতবাদের সাথে সাংঘর্ষিক নয় এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সীল মোহরভঙ্গও করে না। অন্যদিকে, অন্যান্য মুসলমানরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চূড়ান্ত নবুয়ত স্বীকার করলেও বলেন যে ঈসা (আ.) পুনরায় নবী হিসেবে আগমন করবেন।

সুতরাং আজকে আমাদের সাথে অন্যান্য মুসলমানদের প্রধান মতপার্থক্য হলো-আমরা হযরত মির্জা গুলাম আহমদ (আ.)-কে শরীয়তবিহীন নবী মনে করি, আর তারা বিশ্বাস করেন যে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পরে কোনো নবী আসতে পারে না। আমরা বলি, কোনো শরীয়ত-প্রদানকারী নবী আর আসবেন না; তবে শরীয়তবিহীন নবী আসতে পারেন-এতে নবুয়তের সমাপনী বিশ্বাসের কোনো ব্যত্যয় ঘটে না।

আরেক সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন: অস্ট্রেলিয়া সফরের উদ্দেশ্য কী?

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ পঞ্চম (আইদাহুল্লাহু তাআলা বিন?ি?হিল্-আজীয) জবাব দিলেন যে তিনি যেখানেই ভ্রমণ করেন, তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য হলো জামাতের সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎ করা, তাদের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা, তাদের সমস্যাবলি জানা, ব্যক্তিগত দুঃশ্চিন্তা ও প্রয়োজনসমূহ বিবেচনা করা এবং দিকনির্দেশনা প্রদান করা। তিনি ব্যক্তিগত সাক্ষাতে তাদের অবস্থা জানতে পারেন। পরে যখন বড় সমাবেশ বা জলসা অনুষ্ঠিত হয়, তখন তিনি সেখানে ভাষণ দেন, নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং স্মরণ করিয়ে দেন যে যে দেশে তারা বাস করেন, সেটিই তাদের মাতৃভূমি। তিনি তাদের উপদেশ দেন যে তারা যেন তাদের দেশের প্রতি অনুগত থাকে এবং দেশের আইন মেনে চলে। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শিক্ষায় বলা হয়েছে: "হুববুল ওয়াতান

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সুদ খাইও না যাহা (ধন-সম্পদ ও অনিষ্টকে) বহুগুণে বৃদ্ধি করে এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার। (আলে ইমরান: ১৩১)

দোয়াপ্রার্থী: Azizur Rahaman Sb, Lalbag, Murshidabad

যুগ খলীফার বাণী

"জাতি সত্তা অর্জনের জন্য ঐক্য ও আনুগত্য অত্যন্ত জরুরী।" (খুতবা জুমআ, প্রদত্ত- ৫ ডিসেম্বর, ২০১৪)

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, Bankura (W.B)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-10 Thursday, 27 Nov 2025 Issue No.48

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

মিনাল ঈমান-নিজ মাতৃভূমিকে ভালোবাসা ঈমানের অংশ।

অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান যে এটি তাঁর দ্বিতীয় অস্ট্রেলিয়া সফর; তিনি ২০০৬ সালে এর আগে সফর করেছিলেন।

একজন সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করলেন: পরিবারগুলো কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়?

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ জানান- পরিবারগুলো নানা ধরনের সমস্যায় পড়ে, যার অনেক কিছুই ব্যক্তিগত এবং প্রকাশযোগ্য নয়। তিনি তাঁর জুমার খুতবা ও ভাষণসমূহে বারবার আহ্বান জানান যে আহমদিরা যেন ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা অনুসরণ করে, ভালোবাসা-মমতা নিয়ে জীবনযাপন করে, ভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলে, একে অপরের যত্ন নেয়, এবং পরস্পরের হক আদায় করে।

আরেক প্রশ্ন ছিল: অস্ট্রেলিয়ার ভেতরে কি আপনি ভ্রমণ করেছেন?

তিনি বলেন যে বর্তমান সফরে এখনো ভ্রমণ করেননি, তবে পূর্বের সফরে তিনি কয়েকটি অঞ্চলে গিয়েছিলেন এবং অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের সাথেও সাক্ষাৎ করেছিলেন। এই আদিবাসীরা বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন টিকে থাকা সভ্যতার প্রতিনিধিত্ব করেন।

প্রশ্ন করা হলো: অস্ট্রেলীয় সমাজে কি আহমদিয়া মুসলিম জামাতকে গ্রহণ করা হয়েছে?

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ (আইদাহুল্লাহু তাআলা বিনাসরিহিল-আজীয) বলেন: আহমদিয়া মুসলিম জামাত বিশ্বজুড়ে সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য মুসলিম সমাজগুলোর অন্যতম। কারণ আমরা প্রকাশ্যে ঘোষণা করি যে আমরা আমাদের বসবাসরত দেশগুলোকে ভালোবাসি, এবং মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা আমাদের ঈমানের অংশ। দ্বিতীয়ত, আমরা আইন-মান্যকারী। আমাদের বার্তা শান্তির বার্তা, এবং আমাদের মূলমন্ত্র "সবার জন্য ভালোবাসা, কারো জন্য নয় ঘৃণা।" তাই আমি মনে করি না কেউ আমাদের অপছন্দ করবে। সর্বত্রই আমাদের সম্মান করা হয়।

আরেকজন সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করলেন: বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে কিভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব?

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ (আইদাহুল্লাহু তাআলা বিনাসরিহিল-আজীয) বলেন: যেখানে সুযোগ পাই, মানুষকে বলি- শান্তি প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায় হলো প্রকৃত ন্যায়বিচার। আর প্রকৃত ন্যায়বিচার সেই যা কুরআনের মানদণ্ড অনুযায়ী-যাতে প্রয়োজন হলে নিজের, আত্মীয়স্বজনের বা আপনজনের বিরুদ্ধে হলেও সত্য সাক্ষ্য দিতে হয়। এটাই প্রকৃত ইসলাম, এবং এর মাধ্যমে সমাজে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

সিরিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে তিনি বলেন: সিরিয়ায় শান্তি তখনই প্রতিষ্ঠা পাবে যখন উভয় পক্ষ-সরকার ও বিরোধী দল-পরস্পরের প্রতি ভদ্রতা ও ন্যায়পরায়ণতা প্রদর্শন করবে এবং শালীনতার সঙ্গে সমস্যা সমাধানে আগাবে।

তিনি যোগ করেন যে দুই-তিন সপ্তাহ আগে জুমার খুতবায় তিনি এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন এবং স্পষ্ট করেছেন যে পারস্পরিক সহনশীলতা ছাড়া সিরিয়ায় শান্তি ফিরতে পারে না।

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ ব্যাখ্যা করেন: সিরিয়ায় দুটি প্রধান গোষ্ঠী রয়েছে-আলাউইত ও সুন্নি। বর্তমানে সরকার আলাউইতদের নিয়ন্ত্রণে, যদিও কিছু সুন্নিও সরকারের অংশ। তবুও সুন্নিদের অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় এবং তাদের যথাযথ সম্মান দেওয়া হয় না- এগুলো বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্ম দেয়।

তিনি আরও বলেন: সুন্নিরা ক্ষমতায় এলে তারাও ন্যায়বিচারের সাথে শাসন করতে পারবে-এমন নিশ্চয়তা নেই।

তিনি উল্লেখ করেন যে আল-কায়েদা ও তালেবানের মতো জঙ্গিগোষ্ঠীগুলো বিরোধী দলে যোগদান শুরু করেছে, ফলে পরিস্থিতি আরও অবনতি ঘটছে। যদি সরকার ও বিরোধী দল উভয়ই দায়িত্বশীল আচরণ না করে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা না করে, তবে শুধু সিরিয়াই নয়-সারা অঞ্চল এবং এমনকি বিশ্বশান্তিও বিপর্যস্ত হবে।

আরেক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান যে সিডনিতে অবস্থানকালে তিনি মেলবোর্ন ও ব্রিসবেনেও যাবেন।

খিলাফত নির্বাচনের বিষয়ে হযরত খলিফাতুল মসীহ্ (আইদাহুল্লাহু তাআলা বিনরিহিল্-আজীয) বলেন: আমি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জানতাম না যে আমাকে এই দায়িত্ব দেওয়া হবে। খলিফা নির্বাচন এ্যালেক্টোরাল কলেজের মাধ্যমে হয়। নির্বাচনের আগে কেউ জানে না কার নাম প্রস্তাব করা হবে। নাম সেখানেই প্রস্তাব করা হয় এবং ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। যে অধিক ভোট পান, তিনিই খলিফা নির্বাচিত হন। এ্যালেক্টোরাল কলেজের বাইরের কেউও নির্বাচিত হতে পারেন।

তিনি আরও বলেন: আমি পাকিস্তানে শিক্ষা গ্রহণ করেছি। দ্বীনের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছি, আট বছর ঘানায় কাজ করেছি, পরে রাবওয়াহ্, পাকিস্তানে বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেছি। ২০০৩ সালে আমি খলিফা নির্বাচিত হই।

এক সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি মানুষকে-মুসলিম বা অমুসলিম-কী উপদেশ দেন?

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ (আইদাহুল্লাহু তাআলা বিনরিহিল্-আজীয) বলেন: আমরা সবাই মানুষ, আল্লাহর সৃষ্টি। আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকে ভালোবাসেন; অতএব আমাদের উচিত ভালোবাসা, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বের সাথে জীবনযাপন করা, পরস্পরের হক আদায় করা, দায়িত্ব পালন করা এবং একে অপরের সাথে সেই আচরণ করা যা আল্লাহ আমাদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করেন।

অন্য প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন: আমি অন্যান্য মুসলমানদের বিষয়ে কিছু বলতে পারি না, কিন্তু আহমদি যুবসমাজ সারারাত-দিন সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে এবং মানবকল্যাণে আত্মনিয়োগ করে। তারা চ্যারিটি ওয়াক আয়োজন করে। যুক্তরাজ্যে আহমদিয়া যুব সংগঠন চ্যারিটি ওয়াকের মাধ্যমে ৩,৫০,০০০ পাউন্ড সংগ্রহ করেছে, যার ৮০ শতাংশ অমুসলিম চ্যারিটিগুলোকে দান করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে যুবরা "মুসলিমস ফর লাইফ"শীর্ষক ক্যাম্পেইন চালু করে দশ হাজারেরও বেশি ব্যাগ রক্ত সংগ্রহ করে, যা সরকারি হাসপাতালগুলোতে দান করা হয়।

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ উল্লেখ করেন যে আহমদিয়া জামাতের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো-এটি সময়ের খলিফার নেতৃত্বে পরিচালিত হয়, যিনি দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। অন্যান্য মুসলিম সমাজে এ ধরনের নেতৃত্ব নেই। আমরা বিশ্বের ২০৪টি দেশে একই নেতৃত্ব, একই শিক্ষা, একই মটো, একই আচরণ এবং একই প্রশাসনিক কাঠামোর অধীনে একত্রে কাজ করি। কিছু অন্যান্য মুসলিম সংগঠনের মতো আমরা কোনো চরমপন্থা ধারণ করি না। আমরা শান্তিপ্রিয়, শান্তির শিক্ষা দিই, বসবাসকারী দেশের প্রতি অনুগত থাকি এবং আইন মেনে চলি।

****

(খুতবার শেষাংশ .....)

ছিলেন। তিনি যখন স্বামীর সাথে আমেরিকা চলে যান তখন সেখানেও নিজ মজলিসে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে সেবা করার সুযোগ লাভ করেছেন।

তিনি নামায -রোযায় নিয়মিত ছিলেন, তাহাজ্জুদ আদায়কারী, আল্লাহ্‌র ওপর ভরসাকারী, খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা পোষণকারী, অতিথিপরায়ণ, মিশুক স্বভাবের, মানুষের হিতসাধনকারী, দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল অত্যন্ত পুণ্যবতী ও নিষ্ঠাসম্পন্ন একজন মহিলা ছিলেন। চাঁদা প্রদানের ক্ষেত্রে এবং নিয়মিত আর্থিক কুরবানীতে সর্বদা অগ্রসর থাকতেন। খিলাফতের সাথে তার দৃঢ় সম্পর্ক ছিল। আমাকে নিয়মিত দোয়ার জন্য চিঠিও লিখতেন। মরহুমা একজন মুসিয়া ছিলেন। তার কোনোসন্তান ছিল না, কিন্তু অন্যদের সন্তানের প্রতি অনেক ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন। (আল ফজল ইন্টার ন্যাশনাল,১৪ নভেম্বর, ২০২৫)

****

১৩০ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২৫ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৬, ২৭ ও ২৮ শে ডিসেম্বর ২০২৫ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্সানুল জাযা। (নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir